Vol. 36 | No. 1 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সমকালীন নারী-ভাবনা ডা. লুৎফর রহমান ও ‘নারী তীর্থ’

Volume	36
Issue	1
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হাবিব রহমান
Published online	October 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v36i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i1.7
Pages	129-164
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সমকালীন নারী-ভাবনা
ডা. লুৎফর রহমান ও 'নারী তীর্থ'

হাবিব রহমান

১৯৩২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে কাজী আবুদল ওদুদ সমকালের মুসলিম লেখকদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে তিন জনকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। তার মধ্যে ডা. লুৎফর রহমানের (১৮৮৯/৯১-১৯৩৬) নাম ছিল।[১] বস্তুতই বাঙালি মুসলিম লেখকদের মধ্যে চিন্তাশীলতার দিক দিয়ে এই লেখকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিশ শতকের যে-সময়ে তাঁর লেখক-জীবনের শুরু সে-সময়টা ছিল বাঙালি মুসলমানের জাতীয় জাগরণ কামনার কাল। এই কামনার সূচনা হয়েছিল পূর্ববর্তী শতাব্দীর শেষ দু-তিন দশক আগে থেকে। এ সময়কার অধিকাংশ মুসলিম লেখক অধঃপতিত ও হতচেতন নিজ সম্প্রদায়ের জাগরণ কামনায় কলম ধরেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন ইসলামের সমৃদ্ধ অতীতকে ঘুমন্ত জাতির সামনে তুলে ধরতে পারলে তারা আবার জেগে উঠতে পারবে। সেকারণে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মূল আশ্রয় ছিল মুসলিম ঐতিহ্য। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, শেখ ফজলুল করিম, নজিবর রহমান, কাজী ইমদাদুল হক, মুহম্মদ ইদরিস আলী প্রমুখ লেখক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ডা. লুৎফর রহমানও জাতীয় জাগরণ চেয়েছিলেন এবং বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের অধঃপতন ও দুর্গতিই তাঁকে সাহিত্য-সাধনার পথে টেনে এনেছিল। কিন্তু যেহেতু তাঁর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নির্বিশেষ মানুষ, সেহেতু মুসলিম ঐতিহ্য তাঁর মূল আশ্রয় ছিল না। লুৎফর রহমানের একজন জীবনীকারও বলেছেন, '...ডাঃ লুৎফর রহমানের সাধনা ছিল জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে সকল

মানুষের সর্ববিধ উৎকর্ষ সাধন। তিনি নির্বিশেষ মানবকল্যাণের জন্যই লেখনী ধারণ করেছিলেন, তবে তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনার মৌলিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন তৎকালীন বাঙালী, বিশেষ করে মুসলমান সমাজের চরম অধঃপতন এবং দুর্গতি লক্ষ্য করেই।'[২]

লুৎফর রহমানের চিন্তাধারার একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল নারী-সমাজ। দেশের পুরুষ-সমাজ তো অধঃপতিত ছিলই কিন্তু নারীর অবস্থা ছিল শোচনীয়। তারাও যে মানুষ, অনেক ক্ষেত্রে তা মনেই করা হতো না। মানবিক অধিকার ও সম্মান থেকে বঞ্চিত নিপীড়িত নারী-সমাজ এই মানবদরদী লেখকের চিত্ত তাই গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাছাড়া জাতি গঠনে পুরুষের চেয়ে নারীর ভূমিকাকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর চেতনায় নারীর যে-ভাবমূর্তি অঙ্কিত ছিল তাকে তিনি তুলনা করেছেন মাঠের জমির সঙ্গে। জমি যেভাবে তৈরি করা হবে ফসলও ফলবে ঠিক তেমনি।[৩] সেকারণেও দেশের অবহেলিত ও অকর্ষিত সুতরাং আগাছাপূর্ণ নারী-সমাজ তাঁকে যথেষ্ট ভাবিয়েছিল। এই নারীদের মধ্যে যারা আবার নানা কারণে ছিল দুস্থ ও পতিত, যাদের জন্যে ভাবার বা কিছু করবার লোক প্রায় ছিলই না, লুৎফর রহমানের হৃদয় তাদের জন্যে সত্যিই কেঁদে উঠত। এদের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা কীভাবে দেওয়া যায় তা নিয়ে তাঁর যথেষ্ট ভাবনা ছিল। তাদের নিয়ে তিনি স্বপ্নও দেখতেন। এই চিন্তা ও স্বপ্নের কাল্পনিক রূপ আমরা দেখি তাঁর *রায়হান* উপন্যাসে রায়হান ও করিমা কর্তৃক ওমেদপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 'নারী আশ্রম'-এ, আর তার বাস্তব রূপ দেখি কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'নারী তীর্থ'-এ। বস্তুত 'নারী তীর্থ' গঠন বিত্তহীন একজন সাধারণ লেখকের এক অসামান্য ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। এর মাধ্যমে তিনি পতিতা নারীদের বিভিন্ন কাজ শিখিয়ে স্বাধীন জীবিকার্জনের মাধ্যমে পাপের পথ থেকে মানবিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

'নারী তীর্থ' সম্পর্কে উল্লিখিত তথ্যটুকু অনেকের জানা থাকলেও এখন থেকে সত্তর বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই নারী-আশ্রমটির আনুপূর্বিক তথ্যাদি হয়তো অনেকেরই জানা নেই। আজকের বাংলাদেশে যখন বিভিন্ন সাংগঠনিক উদ্যোগে নারীর সমানাধিকার আন্দোলন চলছে এবং বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক কারণে তা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে তখন কোন্ পটভূমিকায় এবং কেন লুৎফর রহমান 'নারী তীর্থ' গঠন করেছিলেন তার কারণ ও পরিচয় অনুসন্ধান গরুত্ববহ বলে বিবেচিত হতে পারে। কেননা এর দ্বারা আমাদের নারীমুক্তি আন্দোলনকারীরা অনুপ্রেরণা ও

আত্মিক শক্তি অর্জন করতে পারেন, আর সাধারণভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেখতে পারেন যে তাঁদের এক নিতান্ত দরিদ্র পূর্বপুরুষ কী দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এক অসামান্য কাজ প্রায় একা হাতে নিয়েছিলেন। বর্তমান নিবন্ধে লুৎফর রহমানের সমকালীন বাঙালির, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের এবং সেই প্রেক্ষিতে লুৎফর রহমানের নিজস্ব নারী-ভাবনা ও 'নারী তীর্থ'র মোটামুটি একটি পরিচয় নিবন্ধকারের সীমিত সুযোগে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

এক

শাস্ত্রে যা-ই বলা হোক না কেন, আধুনিক-পূর্ব ভারতীয় সমাজে সামাজিকভাবে নারীর যে খুব একটা মর্যাদাজনক স্থান ছিল এমন মনে হয় না।[৪] এ মন্তব্য হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কেই কম-বেশী সত্য। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর *এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা* পুস্তিকায় প্রাচীন ভারতের বেশ কিছু বিদূষী ও গুণবতী মহিলার নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁদের সকলের ঐতিহাসিকতা নিঃসংশয় নয়। যাঁরা ঐতিহাসিক ছিলেন তাঁদের ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা যেতে পারে। তাছাড়া শুধু এঁদের দিয়ে সমাজের আসল ও সমগ্র অবস্থাটা বিচার করা যায়ও না। ডক্টর গোলাম মুরশিদ লিখেছেন:

> প্রাচীন সংস্কৃত উপকরণ থেকে মনে হয় কিছু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মহিলা সেকালে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাছাড়া হিন্দুশাস্ত্রেও স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো বিধান নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পূর্ববর্তীকালে যদি নিষিদ্ধ নাও হয়ে থাকে, অন্তত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্ত্রীশিক্ষা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়।[৫]

ভারতীয় নারীর অমর্যাদাজনক সামাজিক অবস্থান বৃটিশ শাসনসূত্রে এখানকার মানুষের ইংরেজি-শিক্ষা সভ্যতার সম্পর্শে আসার পূর্ব পর্যন্ত যত দিন গেছে ততই প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে। এর মূল কারণ বোধকরি তৎকালীন নরনারীর সম্পর্কের মৌল ভিত্তির মধ্যে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। বিশিষ্ট পণ্ডিত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতে প্রাচীন ভারতে এই সম্পর্কের কাম ব্যতীত অন রূপ আবিষ্কারই হয়নি।[৬] মূলত যে সংস্কৃত সাহিত্যের উপর নির্ভর করে তিনি এই মন্তব্য করেছেন, তাতে 'সর্বত্র কামকেই নরনারীর সম্পর্কের অবলম্বন বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে।'[৭] ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত বাঙালি কাম থেকে মুখ ফিরিয়েছে প্রেমের দিকে। তার এই প্রেমমুখীন হওয়াকে নীরদচন্দ্র চৌধুরী বাঙালির জীবনে 'নরনারীর সম্পর্কঘটিত ভাব বিপ্লবের মূল সূত্র' বলে চিহ্নিত করেছেন।[৮]

ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের কিছু আগে থেকে শিক্ষিত বাঙালির চিন্তাচেতনায় একটা বিরাট পরিবর্তনের

হাওয়া লাগে, অনেকেই যাকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বলেছেন। এটা ঘটেছিল শিক্ষিত হিন্দুর জীবনে। বাঙালি মুসলমানের চেতনায় এই পরিবর্তন এসেছিল আরও পরে, বিশ শতকের শুরুর কিছু আগে থেকে। এজন্যে আমরা প্রথমে নারী সম্পর্কে হিন্দুর মনোভাব আলোচনা করে পরে মুসলিম মনোভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চাই।

কথিত নবজাগরণ ঘটার আগে হিন্দু নারীর জীবনের সার্বিক অবস্থা এক কথায় ছিল শোচনীয়। এই শোচনীয়তা কত দূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত সতীদাহ প্রথা। মিথ্যা শাস্ত্রের বিধানে জীবন্ত রমণীকে স্বামীর চিতায় পোড়ানো হতো পাশবিক উল্লাসের সঙ্গে। রামমোহন রায়ের কঠোর চেষ্টার ফলে এই অমানবিক প্রথার রদ যদিও হলো তারপর স্বার্থান্ধ শাস্ত্রীয় হিন্দু আবার নতুন বিধান জারি করল যে বিধবার বিয়ে শাস্ত্রসম্মত নয়। ফলে দেখা দিলো আরেক গুরুতর সামাজিক সংকট। এরই পাশাপাশি ছিল কঠোর অবরোধ প্রথা, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চনা, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি কুপ্রথা। আর এ সবকিছুর মূলে ছিল নারী সম্পর্কে পুরুষের হীন দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে নারী কেবলই পুরুষের দাসী, তার ইচ্ছা পূরণের যন্ত্র। কেবল তা-ই নয়, তাকে বিবেচনা করা হয়েছে 'নরকস্য দ্বার' হিসেবেও।

ইংরেজি শিক্ষাজাত নবচেতনা এই দৃষ্টিভঙ্গির মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে। এর ফলে অন্য সব ক্ষেত্রের মতো নারী-ভাবনাতেও ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন চেতনার সংঘাত বেধেছে। এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই সমাজ এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়েছে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। মুষ্টিমেয় হলেও প্রগতিশীল শিক্ষিত হিন্দু বুঝেছিলেন যে মেয়েদের লেখাপড়া না শেখালে সমাজের বা দেশের কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়। তাছাড়া মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা মানে তাদের মানবিক অধিকার থেকেই বঞ্চিত রাখা—এ-কথাও তারা উপলব্ধি করেছিলেন। এসব ভাবনা থেকেই ১৮৩০-৪০-এর দশকে তারা গোপনে বাড়ির মেয়েদের কিছুটা শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। ভদ্র মেয়েদের জন্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা হতে আরও দেরী হয়েছিল। কিন্তু স্কুল প্রতিষ্ঠা হলেও পর্দা অমান্য করে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো উচিত হবে কিনা এ সিদ্ধান্ত নিতে অনেকের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।[৯]

এরপর যে-সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল তা হলো মেয়েদের ছেলেদের মতো উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন বা ঔচিত্য আছে কি না। ১৮৬০-এর দশকেও

স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তকদের ধারণা হয়েছিল যে মেয়েদের গৃহরক্ষা, রান্নাবান্না, সূচীকর্ম এবং শিশু-পালনের মতো বিষয়ই শেখানো উচিত। অনেক শিক্ষিত মহিলাও এই ধারণা পোষণ করতেন।[১০] এমন কি ১৮৭২-৭৩ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিলীল ও রক্ষণশীল শাখা বিষয়টি নিয়ে এমন মতভেদ প্রকাশ করে যে এ-নিয়ে সমাজ প্রায় ভেঙে যাঁওয়ার উপক্রম হয়েছিল।[১১]

স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকদের মধ্যে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বিরোধীদের অবস্থা কেমন ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে বিরোধীরাও তাদের মেয়েদের সামান্য হলেও শিক্ষা দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। কেননা আধুনিক শিক্ষা বিস্তার লাভ করার ফলে মূল্যবোধের যে পরিবর্তন ঘটছিল তাতে অশিক্ষিত বালিকার জন্যে শিক্ষিত চাকুরিজীবী পাত্র জোটানো ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল।[১২] এভাবে চেতনাগত পরিবর্তন এবং বাস্তব প্রয়োজন উভয় কারণে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে সমাজের জড়তা ভাঙতে শুরু করেছিল।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছিল নারীমুক্তি বা নারী স্বাধীনতার। এ প্রশ্নেও সমাজে শুরু হয়েছিল বিতর্ক আর সংঘাত। গৃহসীমার বাইরে চাকুরিসূত্রে বা অন্য যে-কোনো কারণে বিচরণ রক্ষণশীলরা তো বটেই এমনকি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকদের মধ্যেও অনেকে সমর্থন করেননি। তবু ধীরে ধীরে শিক্ষিত মেয়েরা সংখ্যায় স্বল্প হলেও চাকুরি করতে এগিয়েছেন, পত্র-পত্রিকায় এমনকি পুস্তকাকারেও নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে তাঁরা রচনা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য কখনো-কখনো ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁরা আপোষও করেছেন এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের নিজেদের মধ্যেও সীমাবদ্ধতা ছিল।[১৩] কিন্তু দিন যত গেছে ততই পুরনোপন্থীদের শক্তি কমে এসেছে, লুপ্ত হতে থেকেছে পুরনো ভাবনা।

রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সতীদাহ-প্রথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সমাজে বিধবাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তা গুরুতর সামাজিক সংকট সৃষ্টি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মধ্বজীরা বিধবার বিয়েকে শাস্ত্র ও পাপের দোয়াই দিয়ে নিষিদ্ধ করে রাখে। এর ফলে সমাজে যে পাপের সৃষ্টি হয় তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। কিন্তু মানবতাবাদী প্রগতিপন্থী মানুষ এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন শ্রেষ্ঠ। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ-আইন পাস হয়।

বিধবার বিয়ে না হওয়া যেমন সমস্যা ছিল তেমনি সমস্যা ছিল বাল্য-বিবাহ ও বহু-বিবাহ। এ দুটি প্রথাও নারী জাতির জন্যে কেবল অমর্যাদারই

ছিল না, ছিল রীতিমতো অত্যাচারের। বাল্য-বিবাহের ফলে অল্প বয়সে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অনেক মেয়ের অকাল মৃত্যু ঘটত, স্বাস্থ্য নষ্ট হতো, এমনকি সহবাস জনিত কারণে বালিকা স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনাও বিরল ছিল না। কোলকাতায় এরকম একটি ঘটনার ফলেই আধুনিকরা সোচ্চার হওয়ায় ১৮৯১-এর মার্চে 'সহবাস সম্মতি আইন' পাস হয়।[১৪] এই আইনে বারো বছরের আগে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলে ধর্ষণের অভিযোগে দণ্ডদানের বিধান দেওয়া হয়। রক্ষণশীলরা এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করে। কোলকাতার চেয়ে ঢাকায় প্রতিবাদ হয় বেশি। অনেক মুসলমানও এই প্রতিবাদে অংশ নেয়। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা বিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত চলে। তারপর ১৯৩০-এর এপ্রিলে পাস হয় 'বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন'। এতে ছেলের ১৮ ও মেয়ের ১৪ বছরের কমে বিয়ে হলে তা দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়।[১৫]

বহু বিবাহের সমস্যাটিও ছিল গুরুতর। কৌলীন্য প্রথার কারণে বহু-বিবাহ প্রথার জন্ম হয়েছিল বলে সমস্যাটি মূলত কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্ত্রীর কোনো দায়-দায়িত্ব বহন করতে হতো না বলে সংখ্যাতীত বিয়েতে পাত্রের কোনো সমস্যা হতো না, বরং এতে তার আর্থিক সুবিধাই হতো। কিন্তু দরিদ্র কুলীন কন্যার জীবন অসম্মান আর লাঞ্ছনায় পিষ্ট হতো। নারীত্বের এই অবমাননায় নবযুগের আলোক-প্রাপ্ত মানুষেরা এগিয়ে এসেছিলেন এই প্রথা রহিত করার জন্যে। রামমোহনের সময় থেকেই এর বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু হয়েছিল। পরে সাংগঠনিকভাবে আন্দোলন শুরু হয়। বিধবা-বিবাহ এবং বাল্য-বিবাহের মতো এই আন্দোলনেও বিদ্যাসাগরের বিরাট ভূমিকা ছিল। বহু-বিবাহ বন্ধ করার জন্যে আইন প্রণয়নের কাজও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ সরকার দেশীয় সামাজিক প্রথা সংস্করণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়।[১৬] এর পরও দীর্ঘদিন ধরে প্রথাটির পক্ষে বিপক্ষে বাকবিতণ্ডা চললেও আইন করে এটি বন্ধ করা হয়নি। কিন্তু তাহলেও এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। বিনয় ঘোষ বলেছেন: 'বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাঁরা আইনের দ্বারা সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন তাঁরা তো বটেই, বহু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে যাঁরা বাদানুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে কৌলীন্যপ্রথা ও বহু বিবাহ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, একথা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও, কিছুটা অন্তত উপলব্ধি করেছিলেন'[১৭] এভাবে শিক্ষার বিস্তার, মূল্যবোধের পরিবর্তন ও সমাজের ক্রমরূপান্তরের ফলে প্রথাটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বিবিধ সংস্কার আন্দোলনের ফলে নারী-সমাজ যতটুকু অধিকার অর্জন করতে পেরেছিল তা নানা কারণে বাস্তবে প্রয়োগ করা যাচ্ছিল না। একটি প্রকৃত সংকট এই ছিল যে, একটি সামাজিক নিপীড়ন আইনের দ্বারা বন্ধ হলেও অন্য আরেকটি সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সমকালীন নারী নেতৃবৃন্দ লক্ষ করেছিলেন যে বিভিন্ন নিপীড়িত মেয়ে মুক্তির আশায় আলোড়িত হয়ে উঠলেও অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীলতার কারণে তারা নিপীড়ন সহ্য করতে বাধ্য হয়। এজন্যে তাঁরা বলেছিলেন, মেয়েরা নিজের পায়ে না দাঁড়ালে বা নিজেরা জীবিকা অর্জন করতে না পারলে অর্থনৈতিক পরনির্ভরতার জন্যে সামাাজিক বা পারিবারিক নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবে না। নারী নেতৃবৃন্দের এই মত প্রগতিপন্থী সকল পুরুষের দ্বারাই যে সমর্থিত হয়েছে তা নয়, কিন্তু দিন বদলের সাথে ক্রমশ বেশি সংখ্যক নারী স্বাধীন জীবিকা অর্জনে এগিয়ে এসেছে।

কঠোর অবরোধপ্রথা গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে যাদের আবদ্ধ করে রেখেছিল, নবযুগ কেবল তাদের ঘরের বাইরেই আনেনি, সমাজ ও দেশের বিবিধ কল্যাণকর্মেও উদ্বুদ্ধ করেছে। পরাধীনতার মর্মযন্ত্রণা পুরুষের সঙ্গে তারাও অনুভব করেছেন এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নানাভাবে দেশের মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা শরিক হয়েছেন। নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কেও তারা এতখানি সচেতন হয়েছেন যে সরকারের কাছে তারা ভোটাধিকার চেয়েছেন। ১৯১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর মন্টেগু-চেমসফোর্ড মিশনের কাছে ভারতের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ভোটাধিকারের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করেন। তাদের সে-দাবি তখন মেনে নেওয়া হয়নি বটে কিন্তু ক্রমশ জোরালো দাবি আর আন্দোলনের ফলে ১৯৩৫ সালে সরকার সারা ভারতে মেয়েদের ভোটাধিকার প্রদান করেন।[১৮]

নারীকেন্দ্রিক যে-সব সমস্যা হিন্দু নারীকে পিষ্ট করেছিল তার মধ্যে সতীদাহ ছাড়া অন্যান্য সমস্যা—পর্দা ও অবরোধ, বিধবা-বিবাহ, বাল্য ও বহু-বিবাহ, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চনা প্রভৃতি মুসলিম সমাজেরও ছিল। এর সঙ্গে ছিল আরও একটি সমস্যা—তালাক সমস্যা। কিন্তু এসব সমস্যা মুসলমানদের জন্যে ছিল কৃত্রিম সমস্যা, এর সঙ্গে কোনো ধর্মগত সংস্কার ছিল না। কেননা ইসলাম ধর্মে এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান আছে। ইসলাম নারীকে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখার কথা কখনোই বলেনি। বিধবার বিয়ের জন্যে এই ধর্মে আছে সুস্পষ্ট নির্দেশ। এমনকি ইসলামের নবী নিজেই বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন। ইসলাম বাল্য-বিবাহও সমর্থন করে

না। কেননা এই ধর্মে বিয়েতে পাত্র পাত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এতে বহু-বিবাহের বিধান থাকলেও তার সংখ্যা চারের বেশি নয় এবং সে-বিয়ে শর্তসাপেক্ষ। সে শর্ত মানা সম্ভব না হলে একের অধিক বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। বন্ধ্যাত্ব, সৌন্দর্যহীনতা, চরিত্রহীনতা, ভগ্নস্বাস্থ্য, উন্মাদগ্রস্ততা বা অন্য কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে যে কোনো পক্ষ বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারে, যা ইসলামে তালাকপ্রথা নামে পরিচিত। এই বিধানের সঙ্গেও কিছু শর্ত আছে। বিধানটিতে পুরুষ ও নারী উভয়ের ইচ্ছাকেই মূল্য দেওয়া হয়েছে। এসব সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে যে গুরুতর সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তার পিছনে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার প্রভাব, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ধর্মানুগত্যের অভাব আর স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি কারণ কাজ করেছিল বলে ধারণা করা যায়।

কারণ যা-ই হোক, নারী-সমাজকে ঘিরে কিছু প্রথা ও ধ্যান ধারণা মুসলিম সমাজে যে একটি মারাত্মক সংকট সৃষ্টি করেছিল এবং সে সংকট আরও অনেক কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সমাজের উন্নয়নের গতি রুদ্ধ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। *প্রচারক* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল,

> শাস্ত্রের উপদেশ পদদলিত করিয়া রমণীর প্রতি অত্যাচার করাই ইসলামের পতনের কারণ নহে কি? শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘনপূর্বক রমণীকে অনাদর ও অবজ্ঞা করাই ইসলামের এরূপ দুর্দশার হেতু, ধর্মশাস্ত্রের রচনানুযায়ী রমণীর সম্মান, রমণীর সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ না রাখাই ইসলামের অধোগতির মূলীভূত কারণ। ...আপনার নিজ সহরের বা নিজ গ্রামের মুসলমান রমণীর অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখুন দেখি, তাহারা কিরূপভাবে জীবনযাপন করিতেছে, তাহারা পুরুষের নিকট কিরূপভাবে সমাদৃত হইতেছে, তাহা হইলে আমার কথা সত্য কি অসত্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।[১৯]

কিন্তু এই সংকট মোচনের জন্যে বাঙালি মুসলিম সমাজে রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো কোনো সংস্কারকের জন্ম হয়নি কিংবা বৃটিশ সরকারও হিন্দু রমণীর মতো মুসলিম রমণীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধ করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসেনি।[২০] কিন্তু তাহলেও হিন্দু সমাজের চেয়ে প্রায় অর্ধ শতাব্দী দেরীতে হলেও ইংরেজি শিক্ষাবাহিত নবচেতনা এবং প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববিধ উন্নতি দর্শনে লব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংখ্যায় স্বল্প হলেও বাঙালি মুসলমানকে স্বসমাজের সংকট মোচনে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁদের সে প্রয়াস অবশ্যই নিরঙ্কুশ ছিল না, হিন্দু সমাজের মতো তাঁদের সমাজেও দেখা দিয়ে।[২১] তীব্র ভাবসংঘাত। এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজও ঐতিহাসিক ধারা মেনে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে।

ইসলামে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হলেও এদেশে নারী-সমাজকে যেসব কারণে শিক্ষা-বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল তার দুটি প্রধান কারণের মধ্যে একটি ছিল কঠোর পর্দা বা অবরোধ প্রথা এবং অন্যটি ছিল মেয়েদের লেখাপড়া শেখা অথবা বেশি লেখাপড়া শেখার কোনো প্রয়োজন নেই এমন মনোভাব। ইসলামে মেয়েদের পর্দা মেনে চলার কথা বলা হলেও তাদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখার কথা বলা হয়নি। *মাসিক মোহাম্মদী*-র সম্পাদক লিখেছিলেন: 'আমরা বর্তমানে অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী নহি। এছলাম মুছলমানকে পর্দ্দা সম্বন্ধে যে আদেশ দিয়াছে এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আদেশ ও আদর্শ হইতে আমরা স্ত্রীলোকদিগকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখার কোন প্রমাণ—বহু চেষ্টা সত্ত্বেও—আজ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। ...ভারতবর্ষের বাহিরে আর কুত্রাপি এই শ্রেণীর জাল্লাদী পর্দ্দার প্রচলন নাই। ভারতবর্ষে নানা কারণে এই প্রথার প্রচলন হইয়া যায় এবং কালক্রমে মানুষ ইহাকে ধর্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকে।'[২১] *মোহাম্মদী*-র সম্পাদক 'জাল্লাদ্দী' পর্দা সমর্থন না করলেও ইসলামের নির্দেশ অনুসারে মেয়েদের 'সুরুচি, শ্লীলতা ও ভব্যতার' প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন। নারীমুক্তির অগ্রদূতী বেগম রোকেয়াও বলেছিলেন, 'পর্দ্দা অর্থে ত আমরা বুঝি গোপন হওয়া, বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি—কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে।'[২২] মিসেস এম. রহমান তো পর্দাকে নারীর 'প্রবঞ্চনা' বলে অভিহিত করেছিলেন।[২৩] *সওগাত*-এর প্রগতিপন্থী উদার সম্পাদক লিখেছিলেন, '...মন যেখানে নির্মুক্ত ও পবিত্র নহে, সেখানে অবরোধের সার্থকতা কি? আমরা পর্দ্দা চাই, অবরোধ চাই না। যে পর্দ্দা মানুষকে মানুষ করিয়া তোলে, পূর্ণাঙ্গ হওয়ার সামর্থ্য ও সুযোগ আনিয়া দেয় আমরা সেই পর্দ্দার পক্ষপাতী।'[২৪]

বোঝা যায় যে রক্ষণশীল মুসলমানরা পর্দা বলতে বুঝেছিলেন অবরোধ, কিন্তু এ দুটি যে এক নয় তা প্রগতিপন্থীদের লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রগতিপন্থীরা তাই বিভিন্ন দিক থেকে অবরোধের দোষ ক্রুটি তুলে ধরেছিলেন। এ যে কেবল মনোবিকাশের প্রতিবন্ধক তা-ই নয়, এ যে স্বাস্থ্যের জন্যেও ক্ষতিকর সে কথাও বলা হয়েছিল এবং সে কারণে মেয়েদের জন্যে আলাদা উদ্যান বা পার্ক স্থাপন করার কথাও বলা হয়েছিল।[২৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরবর্তীতে বিশিষ্ট লেখক আবুল ফজল তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে পর্দা প্রথার অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছিলেন তাঁর 'পর্দাপ্রথার সাহিত্যিক অসুবিধা'-নামের এক সাড়া জাগানো প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন: 'বাংলার মুসলমান

সাহিত্যিকদের জন্য মুসলমান সমাজের কল্পলোকের রঙমহল আজ তালাবন্দী, তাই আমাদের দ্বারা যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না—যা হচ্ছে তা হয় অসম্ভব কল্পনা অথবা পরানুকরণ।'[২৬] তবে পর্দা বা অবরোধের সমর্থক একটি দল সর্বদাই ছিল, যাদের অস্তিত্ব আজকের মুসলিম সমাজেও রয়েছে।

পর্দা বা অবরোধের সঙ্গে কেবল শিক্ষার নয়, অর্থনীতির সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ। জীবিকার জন্যে দরিদ্র মেয়েদের ঘরের বাইরে বা পুরুষের সামনে না গিয়ে উপায় নেই। এই শ্রেণীর মুসলিম মেয়েদের কথিত ধর্ম রক্ষা করতে গেলে আহার জুটবে কোথা থেকে সে-প্রশ্ন নিয়ে কোনো ধর্মপ্রবক্তা বা সমাজপতি বা পত্রিকাওয়ালা মাথা ঘামাননি। মালেকা বেগম তাঁর *বাংলার নারী আন্দোলন* গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে পাবনার কোনো এক গ্রামের এক হিন্দু বাড়িতে মুসলিম পরিচারিকা নিগৃহীত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জোতদার মুন্সী আমাবুদ্দীন মণ্ডল ঐ এলাকার ৫০টি গ্রামের মুসলিম অধিবাসীর সভা ডাকেন। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, মুসলিম মেয়েরা বাড়ির বের হওয়ায় যেহেতু তাদের পর্দা নষ্ট হয় সেহেতু তারা হিন্দু বা মুসলমান কোনো বাড়িতেই বা অন্য কোথাও কাজ করতে পারবে না। পঞ্চায়েতগুলোকে এই আদেশ অমান্যকারীদের জরিমানা আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়।[২৭] কিন্তু শাস্ত্র ও সমাজের এসব ভ্রূকুটি সত্ত্বেও দিন বদলের সাথে জীবিকার তাড়নায় মুসলিম মেয়েদেরও বাইরে বেরোতে হয়েছে।

হিন্দু মেয়েদের মতো মুসলিম মেয়েদের জন্যে শিক্ষা নিষিদ্ধ করা না হলেও পর্দা রক্ষা এবং নারী সম্পর্কে অবজ্ঞাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে তাদের শিক্ষার তেমন ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। বনেদী পরিবারে গৃহশিক্ষকের কাছে পর্দার অন্তরালে থেকে কিছু আরবি-ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল মাত্র। উনিশ শতকে যাঁরা প্রথম ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্যে মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁরা নারীশিক্ষার কথা তেমন ভাবেননি। নবাব আবদুল লতিফ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে শিক্ষার জন্যে যা কিছু করেছিলেন তা সবই পুরুষের জন্যে, আর সৈয়দ আমীর আলী নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হলেও তিনি এর জন্যে কিছুই করেননি।[২৮] মুসলমান মেয়েদের জন্যে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয় একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। কোলকাতার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ডা. জহিরুদ্দীন আহমদের কন্যা বেথুন কলেজে ভর্তি হতে চেয়েও পারেনি, সেখানে মুসলিম মেয়েদের পড়ার অধিকার ছিল না বলে। এ ঘটনা কোনো সমাজকর্মীর চিত্তকে উদ্বেলিত করে থাকতে পারে। এরপর কোলকাতার বিশিষ্ট মুসলিম

ব্যক্তিবর্গ আলোচনার মাধ্যমে একটি বড় আকারের মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এরফলে ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা'। এটি স্থাপনের সময় সমাজ থেকে আপত্তি উঠলেও তা টেকেনি।[২৯]

এরপর নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে অদম্য উৎসাহ নিয়ে কোলকাতায় আবির্ভাব ঘটে নারীমুক্তির অগ্রদূতী নামে অভিহিত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের। ১৯১১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। দুই দশকের বেশি সময় ধরে এই স্কুল চালালেও নিজের স্বপ্নকে তিনি সম্পূর্ণরূপে সফল করতে পারেননি। কেননা তীব্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রীর অভাবে স্কুলে তিনি বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি।[৩০] ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রসার-প্রচেষ্টায় নবাব ফয়জন্নেসা চৌধুরানীর অবদানও স্মরণীয়। ১৮৭৩ সালে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে কুমিল্লায় তিনি একটি উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন আর পশ্চিম গাঁওয়ে স্থাপন করেছিলেন একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়।[৩১]

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবেও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস চলছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'। ঢাকা কলেজে পাঠরত কতিপয় ছাত্র এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক অভিনব পদ্ধতিতে নারীশিক্ষার অভিযান চালায়। নারী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দুঃসাধ্য বলে তারা গৃহশিক্ষাকে অবলম্বন করে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণের মাধ্যমে মেয়েদের বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাতেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সম্মিলনের পক্ষ থেকে পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট ও পারিতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল।[৩২] এ প্রচেষ্টা সাময়িক ও সীমাবদ্ধ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ নারীশিক্ষার জন্যে অন্তরে যে তীব্র তাগিদ অনুভব করেছিলেন এ প্রয়াস তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রগতিশীলদের এ সব প্রচেষ্টা যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। যারা নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন না তাদের ছাড়াও সমর্থকদের মধ্যেও অনেকেরই যথেষ্ট রক্ষণশীলতা ছিল, এমনকি পরস্পরবিরোধী মনোভাবও। যে *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকা ১৯০১ সালের আদম শুমারি রিপোর্টে উল্লেখিত পাঁচ শ মুসলমান নারীর ইংরেজি শিক্ষার সংবাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পক্ষে ওকালতি করেছিল, সেই পত্রিকাই আবার পরে লিখেছিল,

> ...স্ত্রীশিক্ষা বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু তাহার একটা সীমা নির্দিষ্ট থাকা চাই। অর্থাৎ কোরান শরীফ পড়া, কিছু উর্দু ও সামান্য রকম বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা একান্ত দরকার। তাহা হইলে উর্দু ও বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানি মসলা-মসায়েলের কেতাবগুলি পাঠ করিয়া ধর্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় রীতিনীতি অবগত হইয়া শরাশরীয়ত অনুযায়ী সমস্ত ধর্মকার্য যথা নিয়মে সম্পাদন করিতে এবং বাঙ্গালা ভাষায় ললনা সুহৃদ বা তুল্য কোন স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া সাংসারিক কাজ কর্মের সুশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য রক্ষা, সন্তান লালন-পালন রীতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারা যায়, এই হেতু আমাদের সমাজের ভগ্নিগণকে ঐ পরিমাণ বিদ্যাশিক্ষা করিতে অনুরোধ করি। তাহাদের উচ্চ শিক্ষা লাভ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।[৩৩]

পর্দা প্রথার সমর্থন , নারীর উচ্চ শিক্ষা ও সহশিক্ষার বিরোধিতা ইত্যাদি কারণে বর্তমান শতকের বিশের দশকে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে প্রথম এম. এ. ফজিলাতুন্নেসা যখন বোরখা ছাড়া শাড়ি পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন তখন নানাভাবে তাঁর বিরোধিতা করা হয়েছিল। এমনকি তাঁর প্রতি ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারা হতো বলেও শোনা যায়।[৩৪] কিন্তু সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারীশিক্ষার প্রসার ধীর গতিতে হলেও বাড়তে থাকে। শিক্ষিত মহিলার চাকরি গ্রহণ বা স্বাধীন জীবিকা নিয়েও প্রচণ্ড বিতর্ক ছিল। এ ব্যাপারে প্রগতিপন্থীদের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েদের স্বাধীন জীবিকার্জনের সমর্থক ও উৎসাহীদের সংখ্যা একেবারে বিরল ছিল না। বেগম রোকেয়া তো কেবল চাকুরিই নয়, প্রয়োজনে মেয়েদের ব্যবসা ও কৃষিকাজের কথাও বলেছিলেন। আয়েশা আহমদ্ নামে একজন প্রগতিবাদী মহিলা লিখেছিলেন: 'কন্যাকে অপাত্রে বা কুপাত্রে অর্পণ করিয়া তাহার জীবনব্যাপী দুঃখের সৃষ্টি না করিয়া স্থল বিশেষে তাহাকে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিবার সুযোগ দিলে আভিজাত্যের হানি হইবে না, এ শিক্ষা আমাদের লাভ করা উচিত। নারী ভদ্রভাবে উপার্জ্জনক্ষম হইলে অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান হয়।'[৩৫] সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রগতিশীলদের সহায়তায় গণিতে প্রথম শ্রেণী পাওয়া ফজিলাতুন্নেসা উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিলেত পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

তখনকার মুসলিম নারীর জীবনে বিবাহ নামক ব্যাপারটিই বোধকরি সবচেয়ে বেশি সংকট সৃষ্টি করেছিল। বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, পণপ্রথা, তালাক প্রভৃতি বিষয়গুলি তাদের জীবনকে নিগ্রহের যাঁতাকলে পিষ্ট করেছিল। অথচ এসব সমস্যা অন্তত মুসলিম সমাজে সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। কেননা এসব বিষয়ে ইসলাম ধর্মের ব্যবহারিক শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ নামা আছে। তবু কেন এসব সমস্যার জন্ম হয়েছিল তার কারণ আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামে পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক মতামতের ভিত্তিতে যেখানে বিয়ে ঠিক করার কথা বলা হয়েছে, যাকে 'ইজাব-কবুল' বলা হয়, সেখানে তাই বাল্য-বিবাহ সম্ভব নয়। অথচ মুসলিম সমাজে, হিন্দু সামাজের মতো গৌরীদান প্রথা না থাকলেও, বাল্য-বিবাহ সংঘটিত হতো এবং এর ফলে মেয়েদের জীবনে ও সামগ্রিকভাবে সমাজে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হতো। তাই অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলিম এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। বাল্য-বিবাহের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে *আল-এসলাম* পত্রিকায় লেখা হয়:

> আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা এবং স্বাধীনতালাভের আর এক প্রধান অন্তরায় হইতেছে—বাল্য বিবাহ। বাল্য-বিবাহ যেমন বালকদিগের পক্ষে তেমনি বালিকাদিগের পক্ষেও নিতান্ত অনিষ্টকর, ঘৃণিত ও দোষময়। বরং চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে বালিকাদিগের পক্ষে ইহা অধিকতর অনিষ্টকর। বিবাহের পরে বালিকারা বাল্য স্বভাবসুলভ আনন্দ ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয়।...
> ইহাতে তাহার জীবনের বিকাশের পক্ষে নিতান্তই বাধা ঘটে।
> আর বিবাহ হইলে পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটা স্বাভাবিক।...তাহার পর বাল্য বিবাহের ফলে অপরিণত বয়সে বা যৌবনশ্রী সামান্য উদভিন্ন হইবার সঙ্গেই বালিকাদের প্রতি অধিকাংশ স্থলেই যে সমস্ত পৈশাচিক ও দানবীয় অত্যাচার করা হয় তাহা শুনিলে ঘৃণা ও রোষের সঞ্চার হয়।
> ...অনেকে অকালে এবং অসময়ে গর্ভধারণ করিয়া নিতান্ত রুগ্ণ কিম্বা জীবনীশক্তিবিহীন শিশু প্রসব করিয়া অকালে শোক প্রাপ্ত হয়। অনেক সময় বাল্য বিবাহিত দম্পতি যৌবন লাভের পর, পরস্পর পরস্পরকে কিম্বা স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে না পছন্দ করিয়া বসে। ইহার পরিণামে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সাক্ষাৎ নরককুণ্ড হইতেও অধিকতর জ্বালাময় সপত্নীর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।...ফলতঃ যেদিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, বাল্য বিবাহে অনিষ্ট ব্যতীত কোনো বিষয়েই ইষ্টের কারণ নাই।[৩৬]

ইসলামে বহু বিবাহের সমর্থন থাকলেও তার সংখ্যা চারের অধিক নয় এবং সে-বিয়েও শর্তসাপেক্ষ। কোরান শরীফে সুরা নিসার তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে পিতৃহীনাদের ওপর সুবিচার করতে পারবে না তবে বিয়ে করবে (স্বাধীনা) নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন বা চার। আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে বা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এভাবেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা বেশী।'[৩৭] কিন্তু এই নির্দেশের অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবন না করে বা অস্বীকার করে 'ইসলামে চারটে পর্যন্ত বিয়ে করা জায়েজ' এই ধারণার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এতে ধর্ম পালন না হোক, কামজ বাসনা চরিতার্থ হয়েছে। কিন্তু সমাজে

এর ফল হয়েছে মারাত্মক। শেখ জমিরুদ্দিনের একটি লেখা থেকে তার স্পষ্ট পরিচয় মেলে—

> সুবিশাল বঙ্গদেশে প্রায় তিন কোটি মুসলমানের বাস। এই তিন কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় দশ পনের লক্ষ মুসলমানের কেহ দুই, কেহ তিন, কেহ বা চার বিবাহ করিয়া একজনকে বিবি ও অপরকে তাহার বাঁদী করিয়া অসহ্য যাতনা দিতেছে। কত সময়ে কত সরলা, অবলা বালা, কুলমহিলা, নির্মম অত্যাচারী পাষণ্ড স্বামীর অসহনীয় যাতনা ও কুলকলঙ্কিনী নরপিশাচিনী সতীনের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ হলাহল পান, কেহ গলে রজ্জু, কেহ বা আফিং সেবন, কেহ বা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া অতি শোচনীয়ভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতেছে।...বর্তমান সময়ে মুসলমানগণ যে বহু বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা কেবল রিপু পূজার জন্য কেবল কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্য।...বর্তমান বহু বিবাহে রাজনৈতিক উপকার কিছুই নাই...দিন দিন ব্যয়াধিক্যবশতঃ দীনহীন কাঙ্গাল ও পথের ভিখারী হইতেছে। তাহারা অর্থাভাবে মূর্খ ও অসভ্য হইয়া সমাজের ঘোর পতন সাধন করিতেছে, তাহাদের দ্বারা সমাজ ও ধর্ম কলঙ্কিত হইতেছে।[৩৮]

শেখ জমিরুদ্দীনের মতো আরও অনেক লেখক ইসলামে বহু-বিবাহের ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করে একালে এর বিষময় ফল এবং তা উচ্ছেদের কথা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন।

বিধবার বিয়ে নিয়েও মুসলিম সমাজে কেনো সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়, অথচ তা হয়েছিল। তবে এই সমস্যা ছিল মূলত তথাকথিত আশরাফ সমাজের। কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে তা মোল্লা-মৌলবীরাও ঠিক করতে পারেননি। সমাজের অবস্থা সম্পর্কে ভাবিত একজন লেখক লিখেছিলেন, '...শত শত আলেম ওলামা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও এই কুসংস্কার বা কুপ্রথার মূল কিছুতেই উচ্ছেদ হইতেছে না। ঐ সকল আলেম ওলামাকেও বাধ্য হইয়া অনুকূল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে হইয়াছে সুতরাং এই ভয়ঙ্কর কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ কিভাবে হইবে, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না।'[৩৯] আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাটি সম্পর্কেও মুসলমানরা সচেতন হয়ে ওঠে এবং এর বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু হয়।

বিবাহকেন্দ্রিক আরও কয়েকটি নারীসমস্যা মুসলিম সমাজে ছিল। পণপ্রথা ইসলাম ধর্মানুমোদিত নয়, তবু হিন্দু সমাজের মতো এটিও মুসলিম সমাজে শিকড় গেড়েছিল। *সাম্যবাদী*-র সম্পাদক এ সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, হিন্দু সমাজের দেখাদেখি, আমাদের মুসলমান সমাজে যেমন জাতিভেদ স্থান পাইয়াছে, তেমনই উহার ফলস্বরূপ যে পণপ্রথা, ইহাও আমাদের মধ্যে চুপে চুপে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতছে।

কন্যাপণ তো বহুদিন হইতেই চলিয়াছে...ইহার উপর বরপণের নেশাও ক্রমশঃ আমাদিগকে পাইয়া বসিতেছে। আজকাল কাহারও ছেলে একটু লেখাপড়া শিখিলেই অথবা কেহ বংশে বড় এরূপ ধারণা থাকিলেই তিনি আশা করেন যে, তাহার ছেলের সহিত যে পাত্রীর বিবাহ হইবে, তাহার পিতা পাত্রকে নগদ টাকা কড়ি ও কন্যাকে অলঙ্কারাদি দিবেন।...আমরা সময় থাকিতে সমাজকে এ বিষয়ে সাবধান হইতে অনুরোধ করি না হইলে ইহার ভবিষ্যৎ ফল বিষময় হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।'[৪০]

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাস্তব কারণে ইসলামে বিবাহবিচ্ছেদের বিধান আছে। একে তালাক বলা হয়। তালাকের অধিকার স্বামী স্ত্রী উভয়েরই আছে। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজে বাস্তবে দেখা যায় এ অধিকার প্রায় একতরফাভাবে পুরুষই ভোগ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ধর্মানুমোদিত কারণে নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থের জন্যে। বাঙালি মুসলমান সমাজে, বিশেষ করে দরিদ্র ও অশিক্ষিত শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীত্যাগ এক মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি করেছিল, যার অবসান আজও হয়নি। এর কারণ হিসাবে মোহাম্মদ আকরাম খাঁ লিখেছিলেন, '...আমাদিগের দেশে সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে, পুরুষের স্ত্রীবর্জ্জনের অধিকার কোন নিয়ম-কানুনের অনুশাসন মানিতে বাধ্য নহে। পক্ষান্তরে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাও তাহার নিয়মহীন, শর্ত্তহীন অবাধ অধিকার আছে। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে, মুসলমান সমাজ–বিশেষতঃধার্মিকতার সোল এজেন্সীর দাবিদারগণ—স্ত্রী বর্জ্জন ও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার যে ঘোর ঘৃণাজনক ব্যভিচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতেও বুক ফাটিয়া যায়।' কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে সে-বিষয়েও তিনি ভেবেছিলেন। উক্ত একই রচনায় তিনি আকুলভাবে আহ্বান জানিয়েছিলেন—'আজকাল অনেক মুছলমান ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হওয়ার জন্য বহু অর্থ ও শ্রমের সদ্ব্যয় ও অপব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কি মিসরের অনুকরণে বিবাহ সংক্রান্ত আইনের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিতে পারেন না?...মোছলেম লীগ, জমইয়তে ওলামা ও অন্যান্য মোছলেম প্রতিষ্ঠানগুলিকে এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিতেছি।'[৪১]

এইসঙ্গে আরেকটি বিষয় নিয়েও কেউ কেউ ভেবেছিলেন। তা হচ্ছে কাবিন। কাবিন হলো বিয়ের সময় স্বামীর নিকট থেকে যৌতুক স্বরূপ স্ত্রীধন ও অন্যান্য শর্ত লেখা রেজিস্ট্রিকৃত দলিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় ছাড়া বাঙালি মুসলিম সমাজে এই দলিল রেজিস্ট্রি করা হয় না বললেই চলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মুখে মুখে থাকে। কাবিনের শর্ত অনুযায়ী স্থিরীকৃত সম্পদ বা

অর্থ স্বামী তার স্ত্রীকে পরিশোধ করতে বাধ্য। অবশ্য স্ত্রী ইচ্ছা করিলে মৌখিক ভাবেও স্বামীকে এই ঋণ থেকে মুক্তি দিতে পারে। কৌশলী পুরুষ তাই বহু ক্ষেত্রেই আবেগের সুযোগে স্ত্রীর কাছ থেকে ঋণমুক্ত হয়ে নেয় অথবা ঋণমুক্ত যদি না-ও হয় তথাপি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলেও কাবিনের অর্থ আদায় করা স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং সেক্ষেত্রে কাবিন অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই সত্য অনুধাবন করেই জনৈক প্রগতিবাদী মহিলা ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে এরূপ অর্থহীন কাবিন 'উনান জ্বালান ছাড়া আবশ্যক মত কাজে লাগাবার ক্ষমতা আমাদের আছে?'[৪২]

সর্ব প্রকার মানবিক অধিকার ও মর্যাদা থেকে যারা নারীদের বঞ্চিত করে রেখেছিল সেই পুরুষরাই আবার নতুন চোখে তাদের আবিষ্কার করেছিল। এই আবিষ্কারে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভূমিকা ছিল সন্দেহাতীত। কিন্তু সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি যেহেতু সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ ছিল সেহেতু এই আবিষ্কারেও সীমাবদ্ধতা ছিল এবং তার প্রভাবও অধিক ব্যাপ্ত ও দূরপ্রসারী হতে পারেনি। নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছেন: 'বাংলাদেশে নরনারীর সম্পর্ক ঘটিত ব্যাপারে সকল দিক হইতে নূতন ধ্যান-ধারণা ও আচরণ দেখা দিবার পরও পূর্ব যুগের আচরণ মোটেই লোপ পায় নাই। বাঙালী সমাজের সর্বত্র নূতন ধারার পাশে পাশে পুরাতন ধারা দেখা যাইত। এই কথা কলিকাতা সম্বন্ধেও খাটে, পল্লীগ্রামের তো কথাই নাই। গ্রাম অঞ্চলে ও গ্রাম্য সমাজে—যেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষা বা আচার ব্যবহার পৌছিতে পারে নাই, সেখানে পুরাতন ধারা প্রায় অক্ষুণ্নভাবেই ছিল।'[৪৩] এই উক্তির লক্ষ্য মূলত হিন্দু সমাজ হলেও মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কেও তা সমান সত্য।

তবুও বৃহৎ বাঙালি সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশে হলেও 'নরকের দ্বার' 'শয়তানের ফাঁদ' বলে কথিত নারীদের সম্পর্কে যে মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন শুরু হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই মূল্যায়নের ফলে নারী সমাজে পরিবর্তনের যে-হাওয়া লেগেছিল তা সমাজকে যে একটা ঝাকুনি দিয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। দেরীতে হলেও এবং হিন্দু সমাজের মতো ততখানি জোরালোভাবে না হলেও এই ঝাকুনি মুসলিম সমাজেও লেগেছিল। এর ফলে প্রতিক্রিয়াশীলরা শঙ্কিত হয়ে কোমর বেঁধেছিলেন। কোমর বেঁধেছিলেন মানবতাবাদী নব্যপন্থীরাও। ফলে অনিবার্যভাবে শুরু হয়েছিল সংঘাত। নারী মুক্তির অন্যতম কাণ্ডারী *সওগাত* সম্পাদক নাসির উদ্দীনের একটি বিবরণ থেকে এই সংঘাত ও তারুণ্যের অপরাজেয় মনোভাবের সুন্দর পরিচয় মেলে। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে তাঁর সম্পাদনায় প্রথম *মহিলা সওগাত* প্রকাশিত হয়। এর আগেই মেয়েদের লেখা ও ছবি ছাপা

শুরু হয়েছিল। *মহিলা সওগাত*-এ অন্তত সাতাশ জন মহিলার রচনা প্রকাশিত হয়েছিল আর বিভিন্ন খ্যাতনামা মেয়েদের হাফটোন ছবি ছাপা হয়েছিল তিরাশি খানা। সন্দেহ নেই, এতে মুসলিম সমাজে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। নাসির উদ্দীন লিখেছেন--

> তরুণদের মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা, তার উপর নারীদের ছবি ছাপা, এসব নিয়ে বাদ প্রতিবাদ ও সোরগোলের সৃষ্টি করলেন প্রগতিবিরোধী দলের লোকেরা। আমি যথেষ্ট পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হলেও নারীমুক্তি আন্দোলন পরিচালনার সংকল্পে অটল ছিলাম। গোঁড়া মোল্লাদের আক্রমণ যত বৃদ্ধি পেতে লাগল নারী-জাগরণের কর্মসূচী ততই দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করলাম। স্থির করলাম—মহিলাদের জন্য একটা বিপ্লবমূলক কিছু না করলে তাদের মধ্যে জাগরণ আসবে না। কেবলমাত্র মহিলাদের লেখা ও তাদের ছবিসহ *মহিলা সওগাত* প্রকাশ করলে এ সমাজে কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখা দরকার।[৪৪]

আলোচ্য কালের নারীমুক্তিকামীরা যেটুকু করেছিলেন তাতে সমাজে ব্যাপক কোনো পরিবর্তন এসেছিল এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু আমাদের নারীভাবনায় যে একটি মৌল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তা বোধকরি অস্বীকার করা যায় না। সেদিনকার শিক্ষাহীন, চেতনাহীন অধঃপতিত মুসলিম সমাজে এসব প্রয়াস ও ঘটনা নাসিরউদ্দীনের ভাষায় কিছুটা 'বিপ্লবমূলক' ছিল বৈকি।

দুই

কোনো কোনো কবি-সাহিত্যিকের নামের আগে মানবদরদী, মানবপ্রেমিক ইত্যাকার গুণবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কিন্তু মানুষের প্রতি দরদ বা প্রেমবোধ সাধারণভাবে শিল্পের জন্যে একটি অনিবার্য দাবি। তাই সব লেখক-শিল্পীর মধ্যেই মানুষের প্রতি প্রেমবোধ থাকে। কিন্তু ডা. লুৎফর রহমানের মানুষের প্রতি দরদ বা প্রেমবোধের একটি ভিন্ন মাত্রা ছিল বলে মনে করি অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান হলেও পিতার অমতে বিয়ে করেছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয় এবং পিতার সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হন।[৪৫] পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আজীবন তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে হয়। কিন্তু কেবল এ কারণেই যে তাঁর জীবনে এমনটি ঘটেছিল তা নয়, বরং এর চেয়েও বড় কারণ ছিল তাঁর মানবদরদ। লুৎফর রহমানের পুত্র আবুল ফাত্তাহ জানিয়েছেন যে উপার্জিত অর্থ তিনি কোনোদিনই ঠিক মতো বাসায় আনতেন না, তা ব্যয়িত হতো দুস্থ মানুষের সেবায়। নিজের প্রতি অবহেলার কারণে দারিদ্র্যের সঙ্গে ছিল স্বাস্থ্যহীনতা। ছেলেরা এসব কথা তুললে তিনি সস্নেহে জবাব দিতেন, 'আমি

আমার এবং তোমাদের জন্য বেশী কষ্ট করি না, আমি বেশী কষ্ট অনুভব করি এদেশের নিরন্ন, নিরীহ, অসহায় এবং অবহেলিত মানুষের জন্য এদের জন্য যদি আমি কিছু করিতে না পারি তবে আমার জন্ম বৃথা হইবে।'[৪৬]

উক্ত বিবরণ থেকে ডা. লুৎফর রহমানের মানব প্রেমের প্রকৃতি অনুধাবন সহজ হয়। তিনি যে লেখনী ধারণ করেছিলেন তারও মূলে ছিল ঐ মানবপ্রেম। মানুষকে তিনি 'মানুষ' হওয়ার উপায় শেখাতে চেয়েছিলেন। সে-কারণে তিনি যতখানি না সাহিত্যিক, তার চেয়ে অনেক বেশি গুণে লোক-শিক্ষক। শেষের অভিধাটিই বোধকরি তাঁর আসল পরিচয়। লোক-শিক্ষা দিতে গিয়েই তাঁর কলম হাতে তুলে নেওয়া।

ডা. লুৎফর রহমানের বিশ্বাস ছিল ব্যক্তির চরিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সামাজিক রূপান্তর ও জাতীয় উন্নতি সম্ভব। এজন্যে তিনি প্রথমেই ব্যক্তি-চরিত্র গঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। যেহেতু ব্যক্তিকে নিয়েই সমষ্টি বা সমাজ বা জাতি, সেহেতু ব্যক্তির উপর এই গুরুত্ব প্রদান। ব্যক্তি হচ্ছে জাতির একক। তাই ব্যক্তির গুরুত্ব অনেক। এই ব্যক্তিকে যোগ্য করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। ব্যক্তির শৈশব থেকেই পরিবার সেই ভূমিকা পালন করবে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির এই গঠন কর্মে মায়ের তথা নারীর ভূমিকা একেবারে প্রাথমিক। তাই নারীকেও তার ভূমিকা পালনে যোগ্য করে তোলার প্রয়োজনীয়তা আত্যন্তিক। এই হচ্ছে লুৎফর রহমানের জীবনদর্শন। এই দর্শনে স্বাভাবিক-ভাবেই নারীর রয়েছে বিশিষ্ট একটি স্থান। মনে হয় তাঁর নারীভাবনার এটিই কেন্দ্রবিন্দু।

লুৎফর রহমানের বিভিন্ন রচনায়, বিশেষত উপন্যাস নামে চিহ্নিত লেখাগুলিতে[৪৭] নারী সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানধারণার প্রকাশ ঘটেছে। তবে এ জাতীয় রচনার মধ্যে তাঁর নারীভাবনার সবচেয়ে বেশ প্রকাশ ঘটেছে *রায়হান* ও *প্রীতি-উপহার* বই দুটিতে। আর প্রবন্ধের মধ্যে সম্পূর্ণত নারী বিষয়ক একটি মাত্র রচনাই দেখা যায়। *উচ্চ জীবন* গ্রন্থে সংকলিত এই প্রবন্ধটির নাম 'নারী-পুরুষ'। তাঁর নারীভাবনা বুঝতে রচনাটির গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা প্রধানত উল্লিখিত রচনাগুলি এবং আবশ্যকবোধে অন্যান্য রচনার সহায়তায় তাঁর নারীভাবনার পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

লুৎফর রহমানের নারীভাবনার দুটি মূল সূত্র অন্বেষণ করা যেতে পারে নারী সম্পর্কে তাঁর দুটি উক্তি থেকে। এর একটি হচ্ছে 'নারী তো পুরুষের বন্ধু।'[৪৮] আর অন্যটি 'মেয়েরা কতকটা মাঠের জমির মত। যেমন জমি তৈরী হবে, ফসলও ঠিক তেমনি হবে।'[৪৯] প্রথম উক্তি নরনারীর সম্পর্ক

বিষয়ক আর দ্বিতীয় উক্তি নারীর কল্যাণময় ভূমিকা বিষয়ক। লক্ষ করার বিষয় যে দ্বিতীয় উক্তিটি একান্তভাবে নির্ভর করে প্রথম উক্তিটির উপর অর্থাৎ নরনারীর সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নারীর সামাজিক ভূমিকার সফলতা বা ব্যর্থতা। নারী সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিতান্ত আধুনিক কালের।

নারী সৃষ্টির ইসলামীয় ও খ্রিস্টীয় কাহিনীর মধ্যে একটি গূঢ় সত্য আছে। আদি পুরুষের জীবনের শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতাকে দূর করার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছিল নারী, যিনি ছিলেন সেই পুরুষের নর্ম ও মর্ম সহচরী—পরিচারিকা বা দাসী নয়। পরে পৃথিবীতে এসে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই তাঁরা টিকে থেকেছেন। এভাবেই উদ্ভব হয়েছে মানব সমাজের। এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে লালন করেই লুৎফর রহমান বলেন—'বড় কাজের পথে নারী অন্তরায় এ বিশ্বাস করো না। তোমাকে জয়যুক্ত করবার জন্যই তো নারী আগমন। তোমার দুর্বল বাহুতে, তোমার ভাঙ্গা মনে শক্তি দেবার জন্যই তো সে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে।'[৫০] নারীর এই ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একে সার্থক করে তোলার জন্যে দরকার তাকে যোগ্য করে গড়ে তোলা। এজন্যে প্রয়োজন তার শিক্ষার এবং কর্মশক্তি জাগ্রত করার। কিন্তু পুরুষ সমাজ তাদের সে-সুযোগ দেয় না, সতীত্বের আর শাস্ত্রের ধুয়া তুলে তাদের ঘরের মধ্যে বন্দিনী করে রাখা হয়েছে। সর্বপ্রকার স্বাধীনতা থেকে তারা বঞ্চিত। এর ফলে বিনষ্ট হয়েছে তাদের মনুষ্যত্ব। সে-কারণে নারী তার শক্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। লুৎফর রহমান তাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন সেই সচেতনতা। তাই তিনি নারীকে জানিয়েছেন এই সাহসিক উদাত্ত আহ্বান:

> জাতিকে বড় করবার জন্য, তোমার নিজের জীবনকে বাঁচাবার জন্য তোমাকে আজ ঘরের বের হতে হবে। ইসলাম তোমাকে ঘরের মধ্যে থাকতে বলেনি—তবে তোমার এই বন্দিনী অবস্থা! কে তোমাকে হাতকড়া দিয়ে রেখেছে? সমাজের লজ্জা-দুর্বৃত্ত সমাজকে উপহাস করে, হাতের কড়াকে চূর্ণ করে আজ জীবন-সন্ধানে বেরিয়ে পড়। তোমার গতি সর্বত্র হোক। পাপী লম্পট পুরুষসমাজ তোমাকে বন্দিনী করে সতী করে রাখতে চায়। তোমার সতীত্বের মর্যাদা কি তুমি নিজে বোঝ না? এ কি তোমার অপমান নয়?[৫১]

স্পষ্টতই লুৎফর রহমান নারীর স্বাধীনতা চান। এই স্বাধীনতার অর্থ তাঁর কাছে নারী-শক্তিকে জাগিয়ে তোলা, তাকে শিক্ষিত করা, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার করতে দেওয়া—তবে তা কোনোক্রমেই স্বেচ্ছাচারিতা নয়।[৫২] নারীর কর্মশক্তিকে জাগাতে গেলে প্রথম দরকার শিক্ষার, কিন্তু বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা না থাকলে শিক্ষালাভ করা যাবে কি করে।

যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে এসব ভেবেছিলেন বলেই নারীর স্বাধীনতাকে তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন।

নারী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গে পর্দার কথা ওঠা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে লুৎফর রহমানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশিত হয়েছে *প্রীতি-উপহার* গ্রন্থের কুলসুম চরিত্রের জবানে। কুলসুমকে লেখকের মানসকন্যা বলা যায়। কুলসুমের কথা তাই তার স্রষ্টারই কথা। দাসীদের সম্মান বাড়লে দরিদ্র ভদ্র ঘরের মেয়েরাও পরিচারিকারূপে পরের বাড়িতে চাকরি নিতে পারে—এই অভিমত ব্যক্ত করার পর ননদ হালিমা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কুলকন্যারা পরের বাড়িতে পরপুরুষের সামনে বের হয়ে কি করে কাজ করবে? এই প্রশ্নের যে-জবাব কুলসুম দিয়েছে তাতে লেখকের সংস্কারমুক্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির এক আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়। কুলসুম বলেছে:

> ...অত অবরোধের কথা ভাবলে কাজ চলবে না। প্রয়োজন হলে ভাত না থাকলে পরদা টানিয়ে লাভ কি? কৃষক মেয়েরা কাজের খাতিরে বাইরে বের হলে দোষ কি? পেটের দায়ে কাজ করে পয়সা উপায় করবার সুবিধা না করতে পেরে, বহু রমণী পতিতা হতভাগিনীর জীবন গ্রহণ করে। আহ! তাদের কথা ভাবলে চোখে পানি আসে! পরদার অর্থ বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা নয়, পরদার অর্থ শরম--গা ঢাকা ও পুরুষ হতে একটু দূরে থাকা। প্রয়োজন হলে মেয়ে মানুষের পুরুষের মত মাঠে কাজ করা উচিত—পথে পথে দোকান খোলা উচিত।[৫৩]

এরপর কুলসুম কিছু মোক্ষম প্রশ্ন তুলেছে। পেটের দায়ে যারা বাইরে কাজ করতে বাধ্য হয় তারা কি সব অসতী? অন্তঃপুরে পর্দার মধ্যে কি কোনো পাপকর্ম সংঘটিত হয় না? নারীই কেবল খারাপ হয়, পুরুষ হয় না? তারপর পর্দা সম্পর্কে তার চূড়ান্ত অভিমত হলো—'পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী হয়ে শূন্যে বাস করা সম্ভব, মানব সমাজে নয়।'[৫৪]

মেয়েদের শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লুৎফর রহমান অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এমনকি তাঁর বিবেচনায় পুরুষের চেয়েও নারীর শিক্ষা বেশি দরকার। কেননা নারীর জ্ঞান ও চরিত্রশক্তি অল্প সময়ের মধ্যে জাতিকে উন্নত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে পারে।[৫৫] তবে নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি নিয়ে তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তাহলেও তাঁর লেখা থেকে মনে হয় তিনি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। কেননা তিনি মনে করতেন 'ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে না পারলে, লেখাপড়া শেখার কোন মূল্য নেই।'[৫৬]

বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবকদের মনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে যে একটা নতুন চেতনা জন্ম নিয়েছে লুৎফর রহমান তা জানতেন। সে সম্পর্কের মূল কথা হলো স্ত্রী কামনার সামগ্রী নয়, বন্ধু। তাই স্বামী তাকে নিজের জীবনের সুখে-দুঃখে, অন্তরের সমস্ত বেদনায়, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্নায়-মোটকথা জীবনের নিগূঢ় সত্যে, সর্বপ্রকার অনুভূতিতে সর্বদা একান্ত করে পেতে চায়। এই পাওয়াকেই তিনি 'সত্যিকারের পাওয়া' বলেছেন।[৫৭] কিন্তু যেখানে এমন ঘটে-না সেখানে নারী-পুরুষের মিলন তাঁর মতে অবৈধ।[৫৮] এজন্যে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে তিনি প্রেমকেই বড় করে দেখেছেন। বলেছেন যে, 'ভালবাসা না থাকলে শ্রেষ্ঠ রূপসীও মানুষকে আনন্দ দান করতে পারে না।'[৫৯]

নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণকে লুৎফর রহমান অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে করেন। তাই যারা নারীর সঙ্গে কথা বলা পাপ মনে করে, তার সঙ্গে প্রেম করাকে মনে করে মহাপাপ—তিনি তাদের ধারণাকে নিতান্ত অন্যায় মনে করেন। কেননা তাঁর মতে প্রেমের সঙ্গে পাপের কোনো সংশ্রব নেই, যেখানে তা আছে তা আদৌ প্রেম নয়।[৬০] প্রাক-বিবাহ প্রেমের প্রসঙ্গ না তুললেও তাঁর মতামত বিশ্লেষণ করলে ধারণা হয় যে এতে তাঁর আপত্তি ছিল না।[৬১]

বিবাহ বিষয়েও লুৎফর রহমানের মুক্ত বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার কালে বিবাহ ব্যাপারে মেয়েদের মতামতের কোনো মূল্য ছিল না, আর স্বেচ্ছায় স্বামী নির্বাচনের কোনো ক্ষমতা তো ছিলই না। এই প্রথাকে লুৎফর রহমান সমর্থন করেননি।[৬২] তিনি পণপ্রথারও বিরোধী ছিলেন।[৬৩] কাবিন সম্পর্কে তাঁর জোরালো মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে সেকালে এবং একালেও কাবিন একটি অর্থহীন ধর্মীয় প্রথা ছাড়া কিছুই নয়। সমাজের বা রাষ্ট্রের এ ব্যাপারে মাথাব্যথা আছে বলেও মনে হয় না। তাছাড়া বহুক্ষেত্রেই মেয়েরা স্বামীকে কাবিনের প্রাপ্য মাফ করে দেয়। লুৎফর রহমানের মতে কাবিনের প্রাপ্য মাফ করা ঠিক নয়। তবে অর্থ দ্বারা ধার্যকৃত কাবিন যে শেষ পর্যন্ত মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায় এ তিনি জানতেন। বোধকরি সে-কারণেই কাবিনের পরিবর্তে কিছু জমি কন্যার নামে লিখে নেওয়া ভালো বলে তিনি মনে করেছেন।[৬৪]

বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কেও লুৎফর রহমানের উদার ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে ইসলাম বিবাহ-বিচ্ছেদ বা তালাকের বিধান দিয়েছে এবং সে-বিধানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই তালাকের অধিকার আছে। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে কেবল পুরুষই এ অধিকার ভোগ

করত এবং তা করত স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে। আজকের দিনেও এই অবস্থার সামান্য ইতরবিশেষ ঘটেছে। লুৎফর রহমান এই স্বেচ্ছাচারিতার কঠোর নিন্দা করেছেন। অনেক সময় দেখা যায় যে যুবকরা বিয়ের আগে ভাবী বধূ সম্পর্কে কল্পনায় যে মানসী প্রতিমা গড়ে তোলে তার সঙ্গে বাস্তবের মিল হয় না। যে তা মেলাতে চায় তার বিয়ে না করাই উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়ত তিনি প্রশ্ন তুলেছেন বধূ যে মনের মতো হয় না তার জন্যে দায়ী কে? পিতা তো মেয়ের জন্ম দিয়েই কর্তব্য শেষ করেন। সুতরাং এই অজ্ঞ, মূর্খ নারীকে বিবাহিত জীবনে স্বামীকেই তৈরি করে নিতে হবে।[৬৫] পিতা ও ভ্রাতারূপে নিজ দায়িত্বের ব্যর্থতার দায়ভাগ যে স্বামীরূপেই ভোগ করতে হয় এ সম্পর্কে *বাসর উপহার* গ্রন্থে প্রথম বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে দ্বিতীয় বন্ধুর জবানিতে লেখক একটি স্মরণীয় উক্তি করেছেন: 'সমাজ যখন নারীকে এমন করেই গড়ে তুলছে, তখন তুমি অসন্তুষ্ট হলে চলবে না। যে স্বামী পত্নীর উপর অসন্তুষ্ট, সে-ই কার্যক্ষেত্রে আপন ভগিনী ও কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করে না। তুমি পিতা বা ভাই হয়ে যে অবহেলা কর, তার ফল স্বামীরূপে গ্রহণ করতই হবে।'[৬৬]

পুরুষের চরিত্রহীনতাকে নারী ক্ষমা করবে কি না এই প্রশ্নের জবাবে লুৎফর রহমান দ্বিধান্বিত হলেও যুক্তির কাছে সেই দ্বিধাটুকু উবে গেছে— 'পুরুষের চরিত্রহীনতাকে নারী ক্ষমা করবেন কিনা কেমন করে বলবো? ...পুরুষ যখন নারীর চরিত্রহীনতাকে ক্ষমা করতে পারেন না, নারীও তেমনি পুরুষের চরিত্রহীনতাকে ক্ষমা করতে পারেন না। এই বিশ্বাসহীনতার দ্বারা বিবাহের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়।'[৬৭] জীবনে এমন কঠিন অবস্থা এলে স্বামী বা স্ত্রীকে উভয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যে লেখক বলেছেন। কেননা অনুতাপ ও পাপ স্বীকারে পাপের দোষ নষ্ট হয় বলে তিনি বিশ্বাস করেন। *প্রীতি উপহার*-এ হালিমা কুলসুমকে প্রশ্ন করেছে যে স্বামীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর বাড়ি ত্যাগ করা সম্ভব কিনা। এই প্রশ্নের তাৎপর্য বোধকরি এই যে স্ত্রী তার ঘৃণিত স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে কিনা। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কুলসুম এই প্রশ্নের জবাবে বলেছে স্বামী লম্পট হয়ে স্ত্রীকে যাতে অপমান করতে না পারে তারজন্যে স্ত্রী ইচ্ছা করলে যাতে পুরুষকে তালাক দিতে পারে সে-ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্যে আন্দোলন বা সংগ্রামের কথাও কুলসুম বলেছে এবং দৃষ্টান্ত হিসাবে পাশ্চাত্য আইনের কথা তুলে ধরেছে, যে-আইনে স্বামী বা স্ত্রী যে-কেউ অন্যের চরিত্রহীনতা আদালতে প্রমাণ করতে পারলে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে।[৬৮]

বিবাহিতা নারীর সাংসারিক জীবনে করণীয় কী কী—এসব বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে *প্রীতি উপহার* গ্রন্থের কুলসুম চরিত্রের মাধ্যমে। বইটি বস্তুত আদর্শ গৃহিণীর জন্যে এক উপদেশ-কথা। কিভাবে শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীর সেবা করতে হবে, কিভাবে সন্তান পালন করতে হবে, কিভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে এ বইতে অনেক উপদেশ দেওয়া হয়েছে। লুৎফর রহমানের প্রকৃত ভূমিকা যে একজন লোক-শিক্ষকের তার পরিচয় এ বইয়ে ছড়িয়ে আছে। তাঁর এ ভূমিকাকে বিন্দুমাত্র খাটো না করেও বলা যায় যে, এসব ক্ষেত্রে তিনি কোথাও কোথাও রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে লেখকের মানসকন্যা কুলসুম অনেক দুঃসাহসিক ও যুক্তিনির্ভর মতামত পোষণ করেও পুরোপুরি আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রথমেই উল্লেখ করা যাক বিয়েতে পাত্রপাত্রীর বয়সের ব্যবধান বিষয়ে লুৎফর রহামনের মতামত। তাঁর মতে মেয়ের বয়স ছেলের অর্ধেক বা ২/১ বছরের বেশি হওয়া ভালো। কেননা নারীর শরীর পুরুষ অপেক্ষা দৃঢ় এবং বলবান (?) বলে দুজনে সমসাময়িক হলে বা বয়সের ব্যবধান কম হলে ছেলের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হতে পারে।[৬৯] হালিমার এক প্রশ্নের উত্তরে কুলসুম বলেছে: 'মেয়েরা সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা কম বুদ্ধিমতী, তাদরে রুচি স্বামী অপেক্ষা কম মার্জিত। মানসিক শক্তি ও দৃষ্টিতে মেয়েরা পুরুষ অপেক্ষা হীন, সুতরাং নারীকে স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা উচিত। স্ত্রী যদি স্বামী অপেক্ষা অধিক শিক্ষিতা হন তাহলে স্বামী স্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারেন, তাতে কোন দোষ নেই।'[৭০] কুলসুম আরেক জায়গায় বলেছে—'কটি মেয়েমানুষের দোজখের ভয় আছে, শতকরা একজনারও না।'[৭১] তারপর নারীর সদ্ব্যবহার বলতে সে বোঝে স্বামী যাতে সন্তুষ্ট থাকে তা-ই করা।[৭২] স্ত্রীর মহত্ত্ব যদি স্বামীর চোখে ধরা না পড়ে তবে তা খোদা দেখবেন—এমন কথাও লুৎফর রহমানের রচনায় পাওয়া যায়।[৭৩]

লুৎফর রহমানের লেখায় স্ববিরোধী বক্তব্যের সাক্ষাৎও মেলে। লম্পট বা পিশাচ স্বামীকে ত্যাগ করার অধিকার দরকার হলে সংগ্রামের মাধ্যমে আদায় করার কথা যিনি বলেন, তিনিই আবার ভালো মেয়ের 'ধাঙড়' স্বামী জুটলেও তাকে মেনে নিতে উপদেশ দেন, বলেন যে—'যাকে একবার হৃদয় দেওয়া হয়েছে, তাকে আর কোনমতে ত্যাগ করা চলে না।'[৭৪] এমনকি স্বামী যদি তাড়িয়েও দেয় তবু 'সে কিছুতেই যাবে না। আপন সন্তান যেমন নারী কিছুতেই ত্যাগ করে না, পত্নীও স্বামীকে ত্যাগ করবে না। স্বামী পিশাচ হতে পারে; কিন্তু সে কথা পূর্বে জেনে নেওয়া উচিত ছিল। একবার

স্বামী হলে আর তাকে কোনমতে অগ্রাহ্য করা যাবে না। ...পিতার দোষ যেমন পুত্রের দেখবার দরকার নেই, স্বামীর দোষ-ত্রুটি সমালোচনা করবার অধিকারও নারীর নেই। সম্বন্ধেই সে নারীর পূজনীয়। এর কোন যুক্তি তর্ক নেই। স্বামীর সহিত নারীর এই সম্বন্ধ খোদার ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থা অতি উত্তম, সকল মহাপুরুষ একথা বলেছেন।'[৭৫] পিতা যদি অসন্তুষ্টও হন তবু যিনি অত্যধিক পিতৃভক্তিতেও পত্নী ত্যাগ বা তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া সমর্থন করেন না, সেই তিনিই আবার একটু পরেই বলেন—'পিতামাতা যতই কেন অন্যায় কথা বলুন, তাদের বিরুদ্ধে সন্তানের কিছুই বলার নেই।'[৭৬]

এ জাতীয় দৃষ্টান্ত আরও আছে। কিন্তু তার সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। এসব ক্ষেত্রে লুৎফর রহমান স্পষ্টতই পুরুষের পক্ষে ওকালতি করেছেন, অন্যত্র নারীকে যে উচ্চমূল্য দিয়েছেন এখানে তাকে খাটো করে ফেলেছেন। অথচ আবার স্বামীদেরেও বলেছেন নারীর মর্যদা রক্ষা করতে, স্ত্রীর প্রতি তাদের করণীয় পালন করতে। এ বিষয়ে *বাসর উপহার*-এ ক্ষুদ্র হলেও একটি পরিচ্ছেদই লিখেছেন 'পত্নীর সমাদর' নামে।[৭৭] এই রক্ষণশীলতা ও স্ববিরোধিতা মনে হয় তাঁর যুগেরই বৈশিষ্ট্য। একদিকে ঐতিহ্যের বিরোধিতা, অন্যদিকে ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য সে-যুগের অধিকাংশ ভাবুক ও লেখকের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, যা একালেও একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়।

তিন

ডা. লুৎফর রহমানের নারী-ভাবনায় কিছু রক্ষণশীলতা ও স্ববিরোধিতা থাকলেও এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে নারীকে তিনি নবযুগের নতুন দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। এই দৃষ্টির নাম মানবিক দৃষ্টি। তাঁর মানসপুত্র রায়হানের জবানিতে তিনি বলেছেন: 'নারী নারী বলিয়াই সে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। নারী যে মানুষ-মানুষরূপেই সে অধিক করিয়া আমাদের প্রেম লাভ করিবে। তাহার মানুষ্যত্ব তাহার নারীত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। মানুষ্যত্ব দূরে ফেলিয়া শুধু নারীত্ব আমাদের মন আকৃষ্ট যেন না করে।'[৭৮]

নারীর এই মানুষ্যত্বের অবলুণ্ঠন লুৎফর রহমানের গভীর বেদনার কারণ ছিল। এজন্যে, বিশেষভাবে, দুস্থা ও পতিতা মেয়েদের নিয়ে তাঁর স্বতন্ত্র ভাবনা ছিল। অস্তিত্বের প্রয়োজনে দেহকে যাদের পসার করতে হয়, তাদের তুলনাহীন দুর্ভাগ্য তাঁর চিত্তকে ক্ষত বিক্ষত করে তুলত। ব্যক্তিগত দু-একটি

অভিজ্ঞতা হয়তো এই বেদনার মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। এ জাতীয় দুটি ঘটনার বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাঁর 'শহর ও পল্লীজীবন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে।[৭৯] সে-অভিজ্ঞতার মর্মপীড়া হয়তো একটি মহৎ বাসনার জন্ম দিয়েছিল তাঁর মনে, কিন্তু নির্মম বাস্তবতা সেই বাসনাকে কেবল বেদনাহতই করেছিল—'ইচ্ছা করেছিলাম একটা সেলাই-এর কল কিনে দিয়ে তাকে (জনৈকা পতিতাকে) স্বাধীন ও পবিত্র জীবন যাপনের পথ করে দেব। কিন্তু সাহিত্যিকের তো পয়সা নেই। কেবল বেদনা আছে। মানব জীবনের এই কঠিন দুরবস্থার কথা যখন মনে হয় তখন খোদাকে বলি, হে খোদা আমাকে হত্যা করে এদের বাঁচাও অথবা এদের একটা পথ করে দাও।'[৮০]

এই সুগভীর আর্তি নিজের আর্থিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও লুৎফর রহমানকে একটি মহৎ পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। পতিতা নারীদের অমর্যাদাকর পাপ জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে সামাজিক ও মানবিক জীবনের শোভন মুখশ্রী দেখানোর জন্যে তিনি গ্রহণ করেছিলেন একটি কর্ম-পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার নাম 'নারী তীর্থ'। এর মাধ্যমে পতিতা মেয়েদের তিনি স্বাবলম্বী করে তুলতে চেয়েছিলেন। কেবল আন্তরিক সদিচ্ছা ও দৃঢ় মনোবলকে আশ্রয় করে আজ থেকে সত্তর বছর আগে কর্মকুণ্ঠ বাংলাদেশে একজন বিত্তহীন ও সহায়হীন মানুষ কোলকাতা নগরীতে নারীমুক্তির জন্যে এই যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল জাগে 'নারী তীর্থ' সম্পর্কে। কিন্তু উপাদানের অভাবে 'নারী তীর্থ' সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা সহজ নয়। এর মূল কারণ বোধকরি বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস চেতনার অভাব। লুৎফর রহমানের সামসময়িকরা 'নারী তীর্থ' সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো বিবরণ রেখে যাননি। এমনকি যে মঈনুদ্দীন সাহেব ''নারী তীর্থ' ও 'নারী শক্তি'র সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল' বলে উল্লেখ করেছেন তিনিও প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বেশি কিছু বলেননি।[৮১] সামান্য যে-উপাদান আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তার উপর নির্ভর করে 'নারী তীর্থে'র এই বিবরণ রচনার প্রয়াস পাওয়া গেল।

'নারী তীর্থ' কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সঠিক সন-তারিখ নির্ধারণ করা একটু কঠিন। তবে বিভিন্ন উৎস থেকে মনে হয় এটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'নারী তীর্থে'র মুখপত্ররূপে লুৎফর রহমান *নারী শক্তি* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ কাল ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ।[৮২] লুৎফর রহমান কিছুকাল *সহচর* পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। উক্ত পত্রিকার

১৩২৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় 'নারী তীর্থ' শীর্ষক একটি প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।[৮৩] কবি গোলাম মোস্তফা লুৎফর রহমানের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন ১৯২২/২৩ সালে কোলকাতায় লুৎফর রহমান তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তিনি 'নারী তীর্থ' খুলেছেন।[৮৪] এসব সূত্র থেকে মনে হয় ১৯২২ সালের আগস্টের কাছাকাছি সময়ে 'নারী তীর্থ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৮৫]

লুৎফর রহমান হঠাৎ খেয়ালের বশে 'নারী তীর্থ' প্রতিষ্ঠা করেননি। দুস্থ মানুষের সেবামূলক কর্মতৎপরতার দৃষ্টান্ত তাঁর সামনে ছিল। কোলকাতায় খ্রিস্টান মিশনারী পরিচালিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। কেননা খ্রিস্টান মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এক সময় তিনি সপরিবারে তাদের সঙ্গে কিছুকাল বসবাসও করেছিলেন।[৮৬] 'নারী তীর্থ' গঠনের প্রেরণা ও সাহস তিনি এখান থেকেও পেয়েছিলেন। মঈনুদ্দীন লিখেছেন:

> খ্রিস্টান মিশনারীদের সংস্রবে আসার ফলে তাঁর চিন্তা অনেকটা গঠনমূলক কাজের দিকে ছুটে চলছিল। সেই থেকেই বোধহয় তাঁর মনে 'নারী তীর্থ' গঠনের পরিকল্পনা জাগে।...
>
> তিনি দেখেছিলেন: খ্রিস্টান মিশনারীরা শত প্রলোভনের বেড়াজালে ঘিরে অসংখ্য নরনারীকে তাঁদের 'ধর্মের সুশীতল ছায়ায়' আশ্রয় দান করেছেন; তাঁর মনেও ঠিক তেমনি একটা ভাব জেগেছিল। তিনিও ভেবেছিলেন: গণিকাদের তিনি মুসলিম সমাজে ফিরিয়ে এনে ধর্মজীবন লাভের সুযোগ দেবেন।[৮৭]

সহচর পত্রিকায় মুদ্রিত 'নারী তীর্থ শীর্ষক প্রচারপত্র থেকেও লুৎফর রহমানের ঐ একই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়: 'ইহা একটি সম্পূর্ণ এছলামীয় প্রতিষ্ঠান। যে সমস্ত সংকীর্ণচেতা মানুষ নারীকে পাপের পথে তুলিয়া দিয়াছে, মানব-সমাজে একটুখানি ঠাঁই দিতে সম্মত হয় নাই— সেই অনাথিনীদিগকে আশ্রয় দিয়া কি মুসলমান তাহার সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বাসকে সার্থক করিবে না? পতিত বিধর্মী বলিয়া কি তাহাকে দুয়ার হইতে তাড়াইয়া দিবে?'[৮৮] *সহচর* পত্রিকায় যখন এই প্রচারপত্র প্রকাশিত হয় তখন তার সম্পাদক ছিলেন লুৎফর রহমান নিজেই। সুতরাং এই প্রচারপত্র যে তাঁরই রচনা তা ধরে নেয়া যায়।

কী মহৎ উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে লুৎফর রহমান তাঁর এই নারী-আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা অনুভব করা কঠিন নয়। তাঁর সেই মহৎ উদ্দেশ্যের কথা সামসময়িকরা অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলেছেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির সাংগঠনিক দিক সম্পর্কে তাঁদের লেখা থেকে তেমন কিছু জানা যায় না। এমনকি লুৎফর রহমানের মৃত্যুর পর একমাত্র যে *মোয়াজ্জিন* পত্রিকা তাঁর

উপর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল তাতেও এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তবে এর কার্যনির্বাহী কমিটি সম্পর্কে সামান্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে *সহচর*-এ প্রকাশিত উপর্যুক্ত প্রচারপত্র থেকে। পত্রটি থেকে 'নারী তীর্থ' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও কর্মধারা সম্পর্কেও কিছু কথা জানা যায়:

> মফঃস্বল হইতে বহু দুষ্ট লোক বিভিন্ন ধর্মের বহু বালিকা ও নির্বোধ যুবতীদিগকে ভালবাসার মিথ্যা লোভ দেখাইয়া কলিকাতা শহরে লইয়া আসে। পরিশেষে তাহারা নিষ্ঠুরের মত তাহাদিগকে পথে ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। যে পাপ করিয়া পুরুষ অবাধে মুক্তিলাভ করে, সেই পাপই বহু নারীকে চিরদিনের মত জাহান্নামে পাঠায়। এই সমস্ত স্ত্রীলোককে আশ্রয় দিয়া, বিবিধ শিল্পকার্যাদি শিক্ষা দিয়া, ধর্মজীবন যাপন করিবার সুযোগ করিয়া দিবার জন্য কলিকাতায় সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠান হইয়াছে। ঐ অনুষ্ঠানের নাম—'নারী তীর্থ'। ডাক্তার লুৎফর রহমান এই অনুষ্ঠানের সম্পাদক। বাংলাদেশের সমস্ত নারী সমাজকে ব্যভিচারের কবল হইতে রক্ষা করিয়া করুণার স্নেহশীতল ছায়ায় আশ্রয় দেওয়া এই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এজন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি আছে; সমিতির প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা, কলিকাতা সখাওয়াত স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা আর. এস হোসেন সাহেবা।[৮৯]

এছাড়া আর কারা ঐ কমিটিতে ছিলেন তা প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয়নি।

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত জীবনী-গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ডে বেগম রোকেয়ার জীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে যে রোকেয়া লুৎফর রহমান প্রতিষ্ঠিত 'নারী তীর্থের' কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন।[৯০] অথচ *সহচর* পত্রিকার প্রচারপত্রে বলা হয়েছে তিনি 'কার্যনির্বাহক সমিতির' প্রেসিডেন্ট ছিলেন। লায়লা জামান রচিত রোকেয়ার উক্ত জীবনীগ্রন্থে উল্লেখিত তথ্যের কোনো সূত্র-নির্দেশ করা হয়নি। রোকেয়ার 'নারী তীর্থে'র প্রেসিডেন্ট হওয়াই বিশ্বাসযোগ্য। কেননা আগেই বলা হয়েছে *সহচর*-এর প্রচারপত্রটি লুৎফর রহমানেরই রচনা। সুতরাং তাতে উল্লেখিত তথ্য সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ কম। তাছাড়া নারীমুক্তির দিশারী রোকেয়াকে নারীমুক্তির জন্যে গঠিত একটি সংগঠনের শুধু সদস্যপদ দেওয়া হবে সেটা না হওয়াই অধিক সম্ভব।[৯১] যা-ই হোক, লুৎফর রহমান ও বেগম রোকেয়া ছাড়া 'নারী তীর্থে'র কমিটিতে আর কারা ছিলেন তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। মঈনুদ্দীন 'নারী তীর্থে'র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলে জানালেও তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদে ছিলেন কিনা সে-বিষয়ে কিছু বলেননি।

'নারী তীর্থ' পরিচালনার জন্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকলেও সামসময়িকদের লেখা থেকে ধারণা হয় লুৎফর রহমানই মূলত এর সব দায়িত্ব পালন করতেন। 'নারী তীর্থ' ছিল তাঁর কাছে একটি স্বপ্ন। একে নিয়ে তাঁর অনেক পরিকল্পনা ছিল। সে-সব কথা তিনি বন্ধুদের

বলতেনও।[৯২] 'নারী তীর্থে'র কাজ কিভাবে শুরু ও শেষ হয়েছিল সে-সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিবরণের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ লিখেছেন:

(লুৎফর রহমান) নিরাশ্রয়া ও পতিতা নারীদের উদ্ধারকল্পে, নারী-তীর্থ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন এবং একখানি কাগজ বাহির করেন। তিনি পতিতাদের পাড়ায় গিয়া কয়েকটি প্রতিপত্তিশালিনী মেয়ে হাত করেন এবং তাহাদেরই সহায়তায় পতিতাদিগকে একত্র করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার এ কার্য্য সফল হয়। তিনি মেয়েদের জন্য একটি দরজি রাখিয়া তাহাদিগকে জামা প্রস্তুত প্রণালী শিখাইতে থাকেন এবং চরকা কাটাইতে আরম্ভ করেন। প্রথমে পতিতাদের পাড়াতেই শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ইহাতে তাঁহার পৃষ্ঠাপোষকদের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি করায় তিনি তাহাদিগকে ছকু খানসামা লেনে এক ঘরে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রায় ২০-২৫টি মেয়ে সৎ পথে আসিতে কৃতসংকল্প হয়। এমন সময় তাঁহার এক হিন্দু বন্ধু কতিপয় মহারানীর সাহায্যে তাহাদিগকে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় রাখিয়া শিক্ষা দিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। ইহাতে পতিতারা ছকু খানসামা লেনের বাড়ীতে আসা বন্ধ করিয়া দেয়। ডাক্তার সাহেবও বিরক্ত হইয়া তাঁহার সেই ব্রত ছাড়িয়া দেন। পতিতারা যখন বুঝিল তাহারা প্রতারিত হইয়াছে, তখন ডাক্তার সাহেবকে পুনরায় পূর্ববৎ কার্য্য চালাইতে অনুরোধ করে কিন্তু তিনি আর রাজী হন নাই।[৯৩]

এ সম্পর্কে গোলাম মোস্তাফা লিখেছেন:

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ৫১ নং মির্জাপুর স্ট্রিটে একটি নারী শিল্প বিদ্যালয় খুলিলেন এবং সেখানে চরকার সূতাকাটা, বই বাঁধাই প্রভৃতি কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ৭/৮ জন পতিতা ও দুস্থা নারীও নিয়মিত সেখানে আসিয়া কাজ শিক্ষা করিতে লাগিল। কলিকাতার ও মফঃস্বলের অনেক কাগজেও এই নব আন্দোলনের কথা প্রচারিত হইল এবং হিন্দু-মুসলমান সকলেই ডাক্তার সাহেবের এই প্রচেষ্টার প্রতি আর্থিক ও নৈতিক সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন।...

কিন্তু মানুষ সব সময়ই অবস্থার দাস। অন্তরে প্রেরণা থাকিলে কি হয়, অনুকূল অবস্থা ও সুযোগ না জুটিলে বহু সৎ প্রতিষ্ঠানও ধ্বংস হইয়া যায়। ডাঃ লুৎফর রহমানের এই অভিনব প্রচেষ্টাও এই কারণে বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। একে ত দেশবাসী আশানুরূপ সাহায্য করেন নাই, তার উপর তিনি দৈন্য ও অভাবের তাড়নায় দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। ইহার উপরে আবার মারাত্মক ক্ষয়রোগ দেখা দিল। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।[৯৪]

'নারী তীর্থে'র অবলুপ্তি সম্পর্কে মঈনুদ্দীন লিখেছেন:

যে সকল দুঃখিনী মেয়ে নারী তীর্থের সদস্যা হয়েছিল, একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে তাদের নিয়ে আসা হবে, এই ছিল লুৎফর রহমান সাহেবের ইচ্ছা।...

নারী তীর্থের কাজে সাফল্য লাভ করা যায়নি, এর প্রধান কারণ সমাজের সহানুভূতি আর অর্থের অভাব। যে মেয়েরা আসতে চেয়েছিল পাপপুরী ছেড়ে, যাদের নিয়ে এসে লুৎফর রহমান সাহেব আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাদের তাগিদের প্রতিকার

> করতে না পারার গ্লানিতে তিনি ক্রমশঃ ওপাড়ায় যাওয়া কমিয়ে দিলেন। এরপর নারী তীর্থের কাজে ইতি পড়ে গেল।...
> কিছুদিন পর দেখা গেল, লুৎফর রহমান সাহেব সপরিবারে ৫১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটে আছেন। ওখানে সপরিবারের গোলাম মোস্তফা সাহেবও নীড় বেঁধেছেন।[৯৫]

'নারী তীর্থ' সম্পর্কে যাঁদের বিবরণ উপরে উদ্ধৃত হলো তাঁরা তিন জনই লুৎফর রহমানের সামসময়িক ও তাঁর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। অথচ তিন জনের বিবরণের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। অধ্যাপক ছানাউল্লাহ 'নারী-তীর্থের' অবলুপ্তির যে-কারণ দেখিয়েছেন তা গেলাম মোস্তাফা ও মঈনুদ্দীনের বিবরণের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। আবার মঈনুদ্দীন লিখেছেন যে, 'নারী তীর্থ' উঠে গেলে লুৎফর রহমান সপরিবারে ৫১ নং মির্জাপুর স্ট্রিটে ওঠেন। সেখানে তখন গোলাম মোস্তফাও সপরিবারে রয়েছেন। অথচ গোলাম মোস্তফা লিখেছেন ৫১নং মির্জাপুর স্ট্রিটে লুৎফর রহমান নারী-শিল্প বিদ্যালয় খোলেন। হয়তো স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে এই গোলমাল ঘটেছে।

উদ্ধৃত বিবরণগুলি ও অন্যান্য সূত্র থেকে মনে হয় 'নারী তীর্থে'র অফিস করা হয়েছিল ৪-১-১ ছকু খানসামা লেনের বাড়িতে।[৯৬] লুৎফর রহমান তখন তাঁর সহযোগী জোবেদ আলীর সঙ্গে সেখানে মেস করে থাকতেন।[৯৭] 'নারী তীর্থে'র কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন ও অফিস হয়ে যাওয়ার পর, অধ্যাপক ছানাউল্লাহ যেমন বলেছেন, মনে হয় লুৎফর রহমান পতিতালয়ে গিয়ে কয়েকজন 'প্রতিপত্তিশালী' পতিতার সহায়তায় অন্যান্য পতিতাদের কাছে 'নারী তীর্থে'র উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। *মোয়াজ্জিন*-এ প্রকাশিত গোলাম মোস্তফার স্মৃতিচারণ থেকে ধারণা হয় লুৎফর রহমান তাঁর কাজের জন্যে হাড়কাটা গলির পতিতালয়কে প্রথমে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় কিছু সংখ্যক মেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিল। এদের নিয়েই তিনি ৫১নং মির্জাপুর স্ট্রিটে নারী-শিল্পবিদ্যালয় খুলেছিলেন। এই বিদ্যালয়ে কতজন মেয়ে আসত তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ সহজ নয়, তবে তাদের সংখ্যা যে বেশি ছিল না তা সহজেই অনুমান করা যায় এবং এ-ও অনুমান করা যায় যে 'নারী তীর্থ' বেশিদিন চলেনি।[৯৮]

'নারীতীর্থ' বেশিদিন না চলার যে-কারণ অধ্যাপক ছানাউল্লাহ উল্লেখ করেছেন তা সঠিক নয় বলেই মনে হয়। কেননা এ সম্পর্কে আর যাঁরা বিবরণ দিয়েছেন তাঁরা অর্থাভাব ও সমাজের অসহযোগিতাকেই প্রতিষ্ঠানটির অবলুপ্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। লুৎফর রহমানের নিজের এমন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না যে তিনি কেবল নিজের প্রচেষ্টায় 'নারী তীর্থ'

চালাবেন। তবু দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য লড়াই চালিয়েও তিনি তাঁর স্বপ্নের তীর্থটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

সমাজে, বিশেষত রক্ষণশীল সমাজে নিকৃষ্টতম পাপিষ্ঠা বলে যারা ঘৃণিত, সেই পতিতাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এক ধরনের বিদ্রোহ। লুৎফর রহমান নিজেও তা জানতেন। *সওগাত* পত্রিকায় 'নারীতীর্থ' শীর্ষক রচনায় তিনি তাই লিখেছিলেন : 'নারীর মুক্তির দিন আসিয়াছে—সে আর অন্ধকারে পাপে ব্যথায় চূর্ণ হইবে না। নারীর সকল দুঃখের বিরুদ্ধে আজ আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলাম।'[৯৯] এই বিদ্রোহের সহযোগী শক্তিরূপে তিনি প্রকাশ করেন মাসিক *নারী শক্তি* পত্রিকা। সম্ভবত 'নারী তীর্থে'র অকাল মৃত্যু হওয়ায় মাত্র ছটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[১০০] নারীর কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্যে নারী-মুক্তি-সেনা গঠনের পরিকল্পনাও লুৎফর রহমানের ছিল।[১০১] কিন্তু সে আশাও ফলবতী হয়নি।

কোলকাতার বাইরে চন্দন নগর, হুগলী প্রভৃতি স্থানের পতিতালয়ে গিয়েও লুৎফর রহমান তাদের উদ্দেশে বক্তৃতা করতেন, শোনাতেন এক পরম আশার বাণী।[১০২] অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে কলঙ্কিত জীবনের লাঞ্ছনাভোগী পতিতাদের কাছে তিনি ছিলেন দেবতার মতো। গোলাম মোস্তফার স্মৃতিচারণ থেকে এর একটি সুন্দর পরিচয় পাই আমরা:

> একদিনের একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। ডাক্তার সাহেব একদিন আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'চলুন, আজ আপনাদিগকে 'হাড়কাটা' গলিতে একটা বাড়ীতে লইয়া যাইব; সেখানে আমার কয়েকজন শিষ্যা আছে।' আমাদেরও খুব কৌতূহল জন্মিল। আমরা ২-৩ জন ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে চলিলাম। জীবনে এক নব অভিজ্ঞতা। অতি সঙ্কোচের সহিত আমরা 'হাড়কাটার' একটা বেশ্যার বাড়ীতে ঢুকিলাম। একটি বেশ্যা লুৎফর রহমান সাহেবকে দেখিয়াই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত আসিয়া গড় হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তারপর একে একে আরও ৩/৪ জন মেয়েলোক সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সকলেরই কণ্ঠে বেশ অমৃতের পিয়াসা এবং মুখে যেন মুক্তির আগ্রহ লেখা। ডাঃ সাহেব তখন তাহাদিগকে বহু উপদেশ দিতে লাগিলেন। সে উপদেশ যে কার্যকরী হইল, তাহা বেশ বুঝা গেল।[১০৩]

দুস্থা ও পতিতাদের জন্যে নারী আশ্রম গঠনের যে-আকাঙ্ক্ষা লুৎফর রহমান হৃদয়ে লালন করতেন তার সফল রূপায়ণ তিনি ঘটিয়েছেন তাঁর কল্পনার সৃষ্টি *রায়হান*-এ। কিন্তু কল্পনা আর বাস্তব তো এক নয়। তাই উভয় পক্ষে সীমাহীন আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অর্থ ও সহযোগিতার অভাবে কারো আশাই সফল হয়নি। কিন্তু পতিতা নারীদের উদ্ধারের জন্যে 'নারী তীর্থ' গঠন করে যে-আদর্শ তিনি স্থাপন করেছিলেন তা ছিল অভাবিতপূর্ব ও অনন্য। তাঁর আগে এদেশের আর কেউ এ জাতীয় কাজে এগিয়ে এসেছিলেন কিনা

আমাদের জানা নেই। মহাত্মা গান্ধী একবার বরিশাল শহরের পতিতাদের জন্যে কিছুটা এ জাতীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে তা 'নারী তীর্থ' গঠনের পরে, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।[১০৪] তাছাড়া লুৎফর রহমান ও মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিও এক ছিল না। এ ব্যাপারে লেখকদের মধ্যেও বোধকরি অদ্যাবধি তিনি অনন্য। বাংলা সাহিত্যের দরদী কথাকার বলে খ্যাত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম জীবনে ছয়/সাত শ বাঙালি কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন।[১০৫] কিন্তু তাদের মুক্তির জন্যে লুৎফর রহমানের মতো কোনো বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। তাই সহায়-সম্বলহীন লুৎফর রহমান তাঁর সীমিত সাধ্য নিয়ে মানবহিতৈষণার যে-অসামান্য কাজটি করতে চেয়েছিলেন সেজন্যে তিনি আমাদের সামাজিক ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে রইবেন।

তথ্যনির্দেশ

১ অন্য দুজনের নাম বেগম রোকেয়া ও কাজী ইমদাদুল হক। আবদুল কাদির সম্পাদিত *রোকেয়া রচনাবলী*-র ভূমিকা, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ.১০

২ এবাদত হোসেন : *ডাক্তার লুৎফর রহমান;* কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, মে ১৯৭০, পৃ. ১০

৩ লুৎফর রহমান: *বাসর উপহার;* আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত *লুৎফর রহমান রচনাবলী* (২য় খণ্ড), আহমদ পাবলিশিং হাউস, পৃ.২৭৩

৪ হিন্দু শাস্ত্রে অবশ্য নারী-বিরোধী উক্তিও আছে। মনু সংহিতা বোধ করি এর বড় দৃষ্টান্ত।

৫ গোলাম মুরশিদ: "সঙ্কোচের বিহ্বলতা: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণীর প্রতিক্রিয়া"; বাংলা একাডেমী, পৃ.৭

৬ নীরদচন্দ্র চৌধুরী: *বাঙালী জীবনে রমণী;* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কোলকাতা, ৫ম মুদ্রণ, পৃ. ২২

৭ ঐ, পৃ.২৩

৮ ঐ, পৃ.৪১

৯ গোলাম মুরশিদ, পৃ.৭

১০ ঐ,পৃ.৩৫

১১ ঐ, পৃ.৩৭

১২ ঐ, পৃ.৩২

১৩ গোলাম মুরশিদ : "বঙ্গদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কৃষ্ণভাবিনী দাস", *জিজ্ঞাসা,* ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা; শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৯, পৃ.১৪১

১৪ মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন.* ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, পৃ.২৬

১৫ ওয়াকিল আহমদ : *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা* (২য় খণ্ড); বাংলা একাডেমী, পৃ.২৫

১৭ বিনয় ঘোষ: *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ;* ১ম ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ, কোলকাতা, ১৯৭৬, পৃ.২৯৬

১৮ মালেকা বেগম, পৃ.৭৬-৭৭

১৯ এস, ও আলী, বি. এল : "রমণী"; *প্রচারক.* ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা; মাঘ ১৩০৬। সংকলিত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম: *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত,* বাংলা একাডেমী,পৃ.৭৫

২০ মালেকা বেগম,পৃ.২৭

২১ সম্পাদক: "সংবাদপত্রে মহিলা চিত্র"; *মাসিক মোহাম্মদী,* ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পৃ. ৯১

২২ বেগম রোকেয়া : 'বোরকা', *মতিচুর* ১ম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত *রোকেয়া রচনাবলী,* পৃ. ৫৭

২৩ মিসেস এম. রহমান: "পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা"; *সহচর,* ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা; চৈত্র ১৩২৯। সংকলিত, আনিসুজ্জামান: *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র,* পৃ. ৩৫১

২৪ সম্পাদক : "পর্দা বনাম অবরোধ"; *সওগাত,* ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা; ভাদ্র ১৩৩৬। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পৃ. ৯৩

২৫ ইসমাইল হোসেন সিরাজী: "স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা"; *আল-এসলাম,* ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা; মাঘ ১৩২৩। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পৃ. ৯০

২৬ উদ্ধৃত, খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম;* বাংলা একাডেমী,পৃ.১০৫

২৭ মালেকা বেগম, পৃ. ৪৪

২৮ ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১২৬

২৯ ঐ, পৃ. ১২৭

৩০ গোলাম মুরশিদ : "ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোষ: বেগম রোকেয়ার নারীমুক্তি ভাবনা"; *জিজ্ঞাসা,* ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা; কার্তিক ১৩৮৭, পৃ. ৩১৫

৩১ ওয়াকিল আহমদ, পৃ.১২৯

৩২ ঐ,পৃ.১২৯-৩০

৩৩ ঐ,পৃ.১৩১-৩২

৩৪ মলেকা বেগম, পৃ.৮৭

৩৫ আয়েশা আহমদ : "মুসলিম সমাজের উন্নতির অন্তরায়"; *সওগাত*, ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা; ভাদ্র ১৩৩৬। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম,পৃ.৭৭

৩৬ ইসমাইল হোসেন সিরাজী:"নারী জাতির দুর্গতি"; *আল-এসলাম*, ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা; ভাদ্র ১৩২৪। ঐ,পৃ.৭৭-৭৮

৩৭ মুহম্মদ হাবিবুর রহমান: *কোরানসূত্র*, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৩৭৯

৩৮ শেখজমিরুদ্দীন : "মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার"; *ইসলাম প্রচারক*, ৫ম বর্ষ ৭ম-৮ম সংখ্যা; জুলাই-আগস্ট ১৯০৩। উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পৃ.১৩-১৪

৩৯ মুহম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ : "মোসলেম সমাজ সংস্কার"; *কোহিনূর*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা; আষাঢ় ১৩০৫। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পৃ.৮২

৪০ সম্পাদক: "বিবাহে বরপণ"; *সাম্যবাদী*, ২য় বর্ষ ৪র্থ-৫ম সংখ্যা; আষাঢ়-ভাদ্র ১৩৩১। ঐ,পৃ.৮৫

৪১ মোহাম্মদ আকরম খাঁ : "এছলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার"; *মাসিক মোহাম্মদী*, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা; পৌষ ১৩৩৪। ঐ,পৃ.৮৬

৪২ মিসেস এম. রহমান: "পর্দ্দা বনাম প্রবঞ্চনা"; *সওগাত*, ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা; ভাদ্র ১৩৩৬। ঐ,পৃ.৭৬

৪৩ নীরদচন্দ্র চৌধুরী, পৃ.৪৮

৪৪ মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন : *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ৪৯৭

৪৫ ডা. লুৎফর রহমান একাডেমীর (খালিশপুর, খুলনা) পরিচালককে লিখিত লুৎফর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র নিয়ামত উল্লার চিঠি; *চেতনা*, ডাঃ লুৎফর রহমান একাডেমী পত্রিকা, মার্চ ১৯৮৯, পৃ.১৩। কোলকাতা থেকে লেখা উক্ত চিঠিতে নিয়ামত উল্লা জানিয়েছেন, "আমার দাদাজান আব্বাকে মুখে ত্যাজ্য পুত্র করলেও আব্বাজানকে সকল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়।"

৪৬ মোঃ আমিরুল ইসলাম্ ফরহাদ: "সমাজ সেবক ও মানব দরদী ডাঃ লুৎফর রহমান"; *চেতনা*, পৃ.৪২

৪৭ এসব রচনায় লোক-শিক্ষা দিতে গিয়ে লুৎফর রহমান উপন্যাসের জনপ্রিয় আঙ্গিকটি গ্রহণ করেছিলেন, সচেতনভাবে উপন্যাস রচনা করেননি। উপন্যাস রচনার প্রতিভাও সম্ভবত তাঁর ছিল না। এগুলিকে তাই যথার্থ অর্থে উপন্যাস বলা যায় না।

৪৮ 'নারী-পুরুষ': "উচ্চ জীবন"; আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত *লুৎফর রহমান রচনাবলী* (১ম খণ্ড), আহমদ পাবলিশিং হাউস, পৃ.৭৩

৪৯ *বাসর উপহার*, প্রাগুক্ত

৫০ *নারী-পুরুষ*, ঐ, পৃ.৭৩

৫১ 'জীবনের ব্যবহার': *উচ্চ জীবন;* ঐ, পৃ. ১২৫

৫২ *নারী-পুরুষ:* ঐ, পৃ. ৮১

৫৩ *প্রীতি-উপহার*, ঐ, (২য় খণ্ড), পৃ.১৬৯

৫৪ ঐ, পৃ. ২২২

৫৫ *রায়হান*, ঐ, (২য় খন্ড), পৃ. ১৭

৫৬ *প্রীতি -উপহার*, ঐ, পৃ. ২৫৫

৫৭ *বাসর উপহার*, ঐ, পৃ. ২৯২

৫৮ *নারী-পুরুষ*, ঐ, পৃ. ৭৭

৫৯ ঐ, পৃ. ৭৭

৬০ ঐ, পৃ. ৮১

৬১ *প্রীতি-উপহার*, ঐ, পৃ. ১২৫

৬২ *বাসর উপহার*, ঐ, পৃ. ৩১৫

৬৩ *প্রীতি-উপহার*, পৃ. ১৮০

৬৪ ঐ, পৃ. ১৩২

৬৫ *নারী-পুরুষ*, পৃ. ৮০

৬৬ *বাসর উপহার*, পৃ. ২৬৭

৬৭ *নারী-পুরুষ*, পৃ. ৭৯

৬৮ *প্রীতি-উপহার*, পৃ. ১৭৩-৭৪

৬৯ *বাসর উপহার*, পৃ. ২৭৫

৭০ *প্রীতি-উপহার*, পৃ. ১৮৪

৭১ ঐ, পৃ. ১৫৭

৭২ ঐ, পৃ. ১৫৬

৭৩ *বাসর উপহার*, পৃ. ২৯৩

৭৪ ঐ, পৃ. ২৭২

৭৫ ঐ, পৃ. ২৯৩-৯৪

৭৬ 'পিতৃ-মাতৃ ভক্তি': *উচ্চ জীবন*, ঐ, পৃ. ১৩১-৩২

৭৭ *বাসর উপহার*, পৃ. ৩৭৬

৭৮ *রায়হান*, পৃ. ৪৩

৭৯ 'শহর ও পল্লী জীবন'; *উষ্ণ জীবন*, ঐ, পৃ. ৯৭-৯৮

৮০ ঐ,পৃ. ৯৭

৮১ মঈনুদ্দীন: "নারী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও একটি কথা"; *মোয়াজ্জিন* (লুৎফর রহমান বিশেষ সংখ্যা), ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

৮২ আনিসুজ্জামান : *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র*, বাংলা একাডেমী, পৃ, ৩৭৯

৮৩ সম্পাদকের ভূমিকা: আবদুল কাদির সম্পাদিত *ডাঃ লুৎফর রহমান রচনাবলী* (১ম খণ্ড); বাংলা একাডেমী, পৃ.২০

৮৪ গোলাম মোস্তফা: "ডাক্তার লুৎফর রহমান সাহেবের স্মৃতি"; *মোয়াজ্জিন, ঐ*

৮৫ ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৩-এ *বুলবুল* পত্রিকায় প্রকাশিত খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনের 'নারী তীর্থের লুৎফর রহমান' শীর্ষক রচনার বরাদ দিয়ে খোন্দকার সিরাজুল হকও জানিয়েছেন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'নারী তীর্থ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজ চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, পৃ.৮২

৮৬ অধ্যাপক মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ : "মরহুম ডাঃ লুৎফর রহমান সাহেব"; *মোয়াজ্জিন, ঐ*

৮৭ *বুলবুল* পত্রিকায় প্রকাশিত মঈনুদ্দীনের প্রাগুক্ত লেখা থেকে উদ্ধৃতি; আবদুল কাদিরের ভূমিকা, ঐ

৮৮ উদ্ধৃত, আবদুল কাদিরের ভূমিকা, ঐ

৮৯ ঐ

৯০ লায়লা জামান: *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন;* জীবনী গ্রন্থমালা ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, পৃ,২৬

৯১ মঈনুদ্দীনও বেগম রোকেয়া 'নারী তীর্থের' প্রেসিডেন্ট ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। খোন্দকার সিরাজুল হক, পৃ.৮২

৯২ অধ্যাপক মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ, ঐ

৯৩ ঐ

৯৪ গোলাম মোস্তফা, ঐ

৯৫ উদ্ধৃত, আবুদল কাদিরের ভূমিকা, ঐ

৯৬ "নারীতীর্থ": *সহচর;* ভাদ্র ১৩২৯, আবদুল কাদিরের ভূমিকা

৯৭ ঐ

৯৮ সম্প্রতি একজন লেখক লিখেছেন: 'অল্পদিনের মধ্যেই এই স্কুলটি (নারী তীর্থ)

বিরাট প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া ওঠে। প্রায় সাত শত পতিতার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানটি চলিতে থাকে। এই স্কুলে তাহাদের কারিগরি শিক্ষাসহ কুটির শিল্প ও হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সমস্ত মহিলা তাঁতের কাজেও পারদর্শী হইয়া ওঠে।' এসব তথ্যের কোনো সূত্র লেখক উল্লেখ করেননি। লুৎফর রহমানের সামসময়িক ও ঘনিষ্ঠদের লেখা থেকে বোঝা যায় এ বিবরণ সঠিক নয়। মোঃ আমিরুল ইসলাম ফরহাদ: ''মানবতাবাদী লেখক ডাঃ লুৎফর রহমানের জীবনকথা''; *দৈনিক পূর্বাঞ্চল*, খুলনা, ৬ই নভেম্বর, ১৯৮৮

৯৯ ''নারী তীর্থ'': *সওগাত*; ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা; চৈত্র ১৩২৮, পৃ, ২৫৯। রচনাটিতে লেখকের নাম-উল্লেখ নেই। *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন লুৎফর রহমান একাডেমীকে জানিয়েছেন যে লেখাটি ডা. লুৎফর রহমানের।

১০০ আনিসুজ্জামান, ঐ

১০১ ''নারীতীর্থ,'' *সহচর*, ঐ

১০২ অধ্যাপক মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ, ঐ

১০৩ গোলাম মোস্তফা, ঐ

১০৪ কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে বরিশাল গিয়ে মহাত্মা গান্ধী শুনেছিলেন যে শহরে তিনশ পতিতা রয়েছে। তাঁর নির্দেশে পতিতাদের সভায় আহ্বান জানানো হয় তারা এলে তিনি তাদের দেশের কাজে আত্মদানের আহ্বান জানান। তাদের জীবিকার দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ১৫/২০ জন মহিলা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তার পর থেকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে চরকা ও খাদির 'কুটির শিল্পাশ্রমে' তারা স্থান পেয়েছিল। মালেকা বেগম, পৃ.৯৪

১০৫ লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি, *শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ* (১৩শ সম্ভার); এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রা. লি. , কোলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ.৪২৭